শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

বিধির-বিধি

প্রকাশক—

শ্রীকালোবরণ ঘোষ

১৭৬ নং রামকৃষ্ণপুর লেন,

হাওড়া।

২৫শে আশ্বিন ১৩২৪।

মূল্য ১।০ সিকা।

এই পুস্তকখানি

আমার

প্রীতি-উপহার প্রদত্ত
হইল।

তারিখ

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ পাল

শ্রীচরণ কমলেষু—

ছোটকাকা! আজ শরৎ আকাশ, মায়ের আগমন সঙ্গীতে মুখরিত;—আনন্দ-হিল্লোল আকাশে বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর এ শুভ-দিনে,—এ শুভ মুহূর্তে আমার বড় আদরের "বিধির-বিধি" মায়ের করুণা মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইল। বাল্যে আপনার স্নেহের পরশে এ জীবন মধুময় হইয়াছিল,—এখনও বোধ হয় সে স্নেহ সমভাবে বহিয়া আসিতেছে। তাহারই স্মৃতি ধরিয়া রাখিবার জন্য আপনার নামেরই সহিত আমার এ ক্ষুদ্র "বিধির-বিধি" সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম। জীবন যবনিকা পতনের পরও কি "বিধির-বিধি" সে স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারিবে না? ইতি—

স্নেহাস্পদ—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

বিধির-বিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরের রাস দেখিবার সখটা নির্ম্মলের বহুকাল হইতেই ছিল কিন্তু সুবিধা ও সুযোগের একত্র সমাবেশ না হওয়ায় সেটা এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। সে অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতে ছিল,—শান্তিপুরের রাস একটা দেখিবার জিনিষ, রাসে এত ধূমধাম বাঙ্গালায় আর কোথায়ও হয় না। সেখানে রাসে যে মিছিল বাহির হয়, তাহা না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। রাসের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিয়া তাহার রাস দেখিবার কৌতূহলটা নাড়াচাড়া খাইয়া কেবলই বাড়িয়া উঠিতে ছিল কিন্তু সখটা আর কিছুতেই পরিপূর্ণ হইতে ছিল না। সহসা সুযোগ ও সুবিধার একত্র সমাবেশ হওয়ায় সে শান্তিপুরে রাস দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বসিল।

নির্ম্মল প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়িতেছিল,—তাহার এক সহপাঠির বাড়ী শান্তিপুর। অন্য সহপাঠির ভিতর তাহার সহিত নির্ম্মলের বন্ধুত্বের বাঁধনটা একটু বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। সেই সহপাঠিটির নাম উপেন। নির্ম্মল একদিন কলেজে যাইয়া শুনিল উপেন আজ বাড়ী যাইতেছে,—কাল তাহাদের দেশের রাস। উপেনের সহিত নির্ম্মলের সাক্ষাৎ হইবা মাত্র সে বলিল, "আমি তো ভাই আজ বাড়ী যাচ্ছি, কাল আমাদের দেশের শেষ রাস, কাল মিছিল বেরুবে। চ'না আমার সঙ্গে রাস দেখে আস্‌বি। আমাদের দেশের রাশ একটা দেখ্‌বার জিনিষ।"

নির্ম্মলের শান্তিপুরের রাস দেখিবার সখটা বহুদিন হইতেই ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়া ছিল, উপেনের কথায় সেটা যেন প্রাণ পাইয়া বেশ একটু সজীব হইয়া উঠিল, নির্ম্মল এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না। সে সেই রাত্রেই উপেনের সহিত রাস দেখিবার জন্য শান্তিপুর রওনা হইল। ট্রেণ যাইয়া যখন শান্তিপুরে উপস্থিত হইল তখন রাত্রি গভীর। পল্লী জননীর রজনীর নিবিড় অন্ধকার চাঁদের আলোয় একেবারে পাতলা হইয়া পড়িয়াছে। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী আকাশ হইতে যেন একটা নীরব শান্তি চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে।

উপেনের দেশ,—তাহার সমস্তই জানাশোনা, কাজেই এই গভীর রাত্রে ষ্টেসনে নামিয়াও তাহাদের কোনই কষ্ট হইল না। উপেন একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া নির্ম্মলকে লইয়া যথা সময়ে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। উপেনের পিতা নাই,—সে অতি বাল্য অবস্থাই পিতৃহীন হইয়াছে। তাহার জননীর স্নেহ ও যত্নে সে রাত্রি নির্ম্মলের মহা আনন্দেই কাটিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্ম্মল রাস দেখিতে বাহির হইল। উপেন তাহাদের দেশে দেখিবার মত যাহা কিছু ছিল তাহার সমস্তই একে একে নির্ম্মলকে দেখাইতে দেখাইতে রাসের মেলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মেলায় লোকে লোকারণ্য,—ভীড় ঠেলিয়া এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। রাস্তার দুই ধারে বাজার বসিয়াছে; দুই পয়সা উপার্জ্জনের আশায় থিয়েটার, বায়োস্কোপ, ম্যাজিক প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিয়া তাবু খাটাইয়া মেলার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে লোকের ধাক্কা খাইতে খাইতে যে রাস্তা দিয়া মিছিল বাহির হইবে নির্ম্মল উপেনের সহিত সেই রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রাস্তায় দুই ধারে অসংখ্য লোক মিছিল দেখিবার জন্য একেবারে গুড়ের কলসীর মত গায়ে গায়ে বসিয়া গিয়াছে,—রাস্তার পার্শ্বস্থিত

একটু ফাঁক পাইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কার্ত্তিক মাস, পূর্ণিমার রাত্রি, কিন্তু আকাশে কালো কালো ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ এখানে সেখানে জড় হইয়া থাকায়, চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই ;— কেমন যেন সমস্ত পৃথিবীটা ঘোলাটে হইয়া পড়িয়াছিল। পথঘাট লোকজন সকলি যেন কেমন একটা ঝাপসা ঝাপসা ঠেকিতেছিল। সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টি পড়ায়, নির্ম্মল উপেনের গা ঠেলিয়া বলিয়া উঠিল, "শুধু বোধ হয় ভীড়ের ধাক্কা খাওয়াই সার হয়, ওই দেখ্ পশ্চিমে কালো মেঘখানা কেমন সাঁ সাঁ করে বেড়ে আসছে, মিছিল বেরুবার বড় সুলক্ষণ দেখছিনি।"

বন্ধুর কথায় উপেনের দৃষ্টি আকাশের দিকে পতিত হইল। আকাশে তখন কালো মেঘ যেন একটা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়া ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতে ছিল : সে তাড়াতাড়ি বলিল, "মেঘের গতিক বড় ভালো নয়, না আর এখানে দাঁড়ান কিছুতেই উচিত নয়। হঠাৎ যদি ঝড় বিষ্টি আসে আর এই ভীড় যদি ভাঙ্গতে আরম্ভ হয় তাহ'লে-আর অন্ধকার রাত্রে বাড়ী ফিরতে হবে না, ধাক্কায় ধাক্কায় যে কোথায় গিয়ে পড়তে হবে তার কোন ঠিক থাকবে না।"

বন্ধুর কথায় নির্ম্মল আর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া

দেখিল, সত্যই আকাশের ভাব গতিক মোটেই ভালো নয়। মেঘখানা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে ঝড় উঠিবার আর বড় বিলম্ব নাই। সে একবার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বেশ একটু ম্লানস্বরে বলিল, "তাহ'লে কল্‌কাতা থেকে এতদূর আশাই শুধু সার হবে, মিছিল দেখা হবে না?"

উপেন তাড়াতাড়ি বলিল, "চলতো এখন একটা বাড়ীর ভিতর ঢোকা যাক্, তারপর মেঘটা একটু কেটে গেলে আবার না হয় বেরুনো যাবে।"

আমি সদলবলে আসিতেছি যেন এই সংঙ্কেত করিয়া বৃষ্টির বড় একটা ফোঁটা নির্ম্মলের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। নির্ম্মল বলিল, "যা বলেছ, এক ফোঁটা বৃষ্টি আমার গায়ে পড়েছে, আর বৃষ্টি আসবার দেরী নেই। চল শিগ্‌গির যেখানে হয় এক জায়গায় ঢুকে পড়া যাক্।"

এলোমেলো হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাও দুই একটা পড়িতে সুরু হইয়াছিল। দুই বন্ধুর আর কথা কহিবার অবসর হইল না,—একটা আশ্রয়ের চেষ্টায় তাহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। লোকের ভীড়ে তাহাদের দ্রুত গমনের একেবারেই সুবিধা হইতে দিল না। পদে পদেই

বাধা ঘটিতে লাগিল। মানুষের গায়ে মানুষ, সম্মুখে একেবারে মনুষ্য সমুদ্র;—সে সমুদ্র ভেদ করে কাহার সাধ্য! তাহাদের অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না, এলোমেলো হাওয়া মৃদু মৃদু বহিতেছিল, সহসা একেবারে সাঁই সাঁই রবে জোর করিয়া উঠিল। রাস্তার সমস্ত ধূলা আকাশে উড়িয়া চারিদিক একেবারে অন্ধকার করিয়া দিল। সেই অসংখ্য জনসংখ্যা ঝড় উঠিবামাত্র একেবারে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আশ্রয়ের আশায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। ঝড় গাছের মাথায় মাথামাতি আরম্ভ করিয়া বৃষ্টির বড় বড় ফোটার সহিত একেবারে যেন একটা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। ঝড় বৃষ্টির প্রচণ্ড বেগে লোকে লোকের ঘাড়ে পড়িতে লাগিল। ধাক্কায় কত লোক রাস্তায় পড়িল,—যাহারা পড়িল তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল। হাহাকারে, আর্ত্তনাদ, কোলাহলে সমস্ত শান্তিপুর যেন এক মুহূর্ত্তে ভরিয়া উঠিল।

নির্ম্মল এতক্ষণ উপেনের হাত ধরিয়াছিল, কিন্তু একটা বড় রকম ভীড় আসিয়া সজোরে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের দুই বন্ধুকে একেবারে বিভিন্ন করিয়া দিল। পরস্পর পরস্পরকে পুনরায় ধরিবার পূর্ব্বেই ভীড়ের ধাক্কায় ধাক্কায় পরস্পর পরস্পর হইতে বহু দূরে যাইয়া

পড়িল। নির্ম্মল বন্ধুর সন্ধানে মাথাটা তুলিয়া একবার মাত্র সম্মুখে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃষ্টির ঝাপটায় চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না। চক্ষের সম্মুখে সে কেবল একটা নিবিড় অন্ধকার দেখিল। এক স্থানে এক মুহূর্ত্তও স্থির হইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই,—ধাক্কার উপর ধাক্কা আসিয়া কেবলই সম্মুখের দিকে সরাইয়া দিতেছে। একটু অসাবধান হইলেই মাটিতে পড়িয়া দলিত পিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বন্ধুকে খুঁজিয়া পাওয়া এক্ষণে অসম্ভব জানিয়া নির্ম্মল ভীড়ের স্রোতে অঙ্গ মেলিয়া ছিল। ধাক্কায় ধাক্কায় প্রায় এক মাইল পথ অসিয়া সে যখন একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসব পাইল তখনও ঝড় ও বৃষ্টির বেগ সমভাবেই চলিতেছিল। বাতাস সাই সাই রবে কাণের পাশ দিয়া ছুটিয়াছে, বৃষ্টিব বড় বড় ফোঁটা মুখে চোখে ক্রমাগতই পড়িতেছে। সে একস্থানে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ডান হস্তে মুখ চোখের উপর হইতে কতকটা জল সবাইয়া দিয়া একবার আসে পাশে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আসে পাশে ;—কাছে ও দূরে জন প্রাণীর চিহ্ন নাই। নায়ক বিহীন ছত্রভঙ্গ সেনার ন্যায় ঝড় ও বৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে যেখানে পাইয়াছে আশ্রয় লইয়াছে। অপরিচিত স্থান,—অন্ধকারময়ী দুর্য্যোগ রজনী,—সঙ্গিবিহীন

নির্ম্মলকুমারের সমস্ত প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল,—তাহার মনে হইল আসে পাশে চারিদিকে যেন একটা বিকীষিকার নৃত্য চলিয়াছে। জামা কাপড় সমস্তই ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে,—তাহা হইতে বৃষ্টির জল ক্রমাগত ঝরিয়া পড়িতেছে। এ বৃষ্টিতে খোলা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব;—নির্ম্মল একটু আশ্রয়ের জন্য যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু অন্ধকারের উপর অন্ধকার তাহার চক্ষের সম্মুখে এমনি ঘন হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে সম্মুখস্থ এক হস্ত দূরেরও সামগ্রী দেখিতে পাইতে ছিল না। সহসা সেই স্তব্ধ অন্ধকারকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত করিয়া দূরে আকাশেব কোলে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল;—গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী যেন আবার একটা বিরাট অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গেল। সেই ক্ষণিক আলোতে নির্ম্মল সম্মুখে একটু দূরে কয়েকখানা মেটে ঘর দেখিতে পাইয়া একটু আশ্রয়ের আশায় সেই দিকে ছুটিল। আবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল, আবার মেঘ ডাকিল, নির্ম্মল ছুটিয়া যাইয়া সেই মেটে ঘরের দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল। বৃষ্টি ও ঝড়ে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইয়াছিল,—মাথার উপর একটু আচ্ছাদন পাইয়া তাহার ধড়ে যেন আবার প্রাণ আসিল। ঝড় বৃষ্টি সম-

ভাবেই চলিতেছিল, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঝড় বৃষ্টির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহার দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত আব ছিল না। সে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া সেই দাওয়ার উপরই বসিয়া পড়িল।

নির্ম্মল সেই খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া, পবনের সহিত বরুণের যুদ্ধ,—প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃতন দেখিয়া একেবারে বিভোব হইয়া গিয়াছিল,—সে অবাক হইয়া তাহাই দেখিতে ছিল সহসা যেন নিকটে পার্শ্বে মনুষ্যের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল। সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল, কিন্তু অন্ধকারে ভালো কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু মানুষের নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কেমন একটা আশঙ্কায় তাহার সমস্ত বুকটা গুরগুর করিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতেই নির্ম্মলের সাহসের ভাগটা একটু বেশীই ছিল, ভয় বলিয়া একটা জিনিষ কোন দিনই তাহার নিকট ঘেসিতে পারে নাই,—সে বেশ একটু দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেগো এখানে, তুমিও কি আমার মত দুর্য্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এখানে আশ্রয় নিয়েছ।"

কেহ কোন উত্তর দিল না, নির্ম্মলের যেন মনে হইল, যাহার নিশ্বাসের শব্দ সে পাইয়াছে, সে এক্ষণে কাঁদিতেছে।

ক্রন্দনের ফোঁস ফোঁস শব্দ অতি ক্ষীণ হইলেও তাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ কবিতেছে। নিম্মল আর কিছুতেই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। পকেটে দেশালাই ছিল, সে তাহা বাহির করিয়া জ্বালিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দেশলাই জলে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল, অনেক চেষ্টাও নির্ম্মল একটা কাটিও জ্বালিতে পারিল না। সহসা সেই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল, সেই আলোতে নির্ম্মল যেন চকিতের জন্য দেখিল তাহারই নিকটে দাওয়ার উপর একটা বালিকা বসিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে। বালিকার বয়স কত তাহা সে ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, তবে তাহার যেন বোধ হইল বালিকা বড় সুন্দরী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিতে আসিতে ক্রমেই বন্ধ হইয়া গেল,—প্রবল পবন আকাশের কালো মেঘখানাকে ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে উত্তর কোন হইতে দক্ষিণ কোনে লইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুনীল আকাশ আবার সুনীলবর্ণ ধারণ করিল। পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়াইয়া যেন সবটা হাসি ঢালিয়া দিয়া পল্লী জননীর নিবিড় অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিল। পথে আবার দুই একজন করিয়া লোক চলাচল আরম্ভ হইল। এইবার মিছিল বাহির হইবে এই কথাটা যেন জানাইয়া দিয়া দূরে গোশাই বাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিল,—বাতাসে ঢাকের শব্দ সমস্ত শান্তিপুরময় ছড়াইয়া পড়িল। নির্ম্মল এ পর্য্যন্ত সেই দাওয়ার উপর বসিয়া বালিকা কে,—সে কাঁদিতেছে কেন প্রভৃতি জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—কিন্তু নানা ভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও বালিকার নিকট হইতে একটীও উত্তর পায় নাই।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে আর এ ভাবে এখানে দাড়াইয়া থাকা উচিত নহে। নির্ম্মল ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল। যাইবার সময় বালিকাকে শেষ একবার জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আবার দাওয়ার দিকে ঘুরিল,—চাঁদের আলো একেবারে সোজা হইয়া দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেই নির্ম্মল আলোয় এতক্ষণে নির্ম্মল বালিকার মুখখানি একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বালিকা তখনও কাঁদিতেছিল। তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখখানির উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে,—চাঁদের হাসি সেই ম্লান মুখখানির উপর পড়িয়া বালিকার অশ্রুজল মুছাইয়া দিবার বিফল চেষ্টায় নিজেই যেন ম্লান হইয়া পড়িতেছে। চাঁদের হাসি বালিকার অশ্রু পরস্পর মেশামিশি হইয়া সেই দাওয়ার উপর এক নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। নির্ম্মল দেখিল বালিকা সত্যই বালিকা,—বয়স যতদূর আন্দাজে বুঝিল বড় জোর বার হইতে পারে। কৈশোর তাহার সেই সুন্দর দেহের ভিতর হইতে কেবল উকিঝুকি দিতেছিল, তাহার এখনও সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। বালিকার পরিধান বস্ত্রখানি অতি মলিন,—চুলগুলি তৈল অভাবে রুক্ষ হইয়া স্থানে স্থানে জটা পাকাইয়াছে। তাহার সমস্ত দেহ জুড়িয়া অযত্ন ও অভাবের চিহ্ন একেবারে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে,—কিন্তু

তথাপি তাহার রূপের জ্যোতি একেবারে বিলীন হইয়া যাইতে পারে নাই। মেঘে ঢাকা চাঁদের মত তাহা যেন আবার একটা নূতন সৌন্দর্য্য ভিতর গিয়া পড়িয়াছে। বালিকার অপরূপ মূর্ত্তি,—মলিন বেশ,—অশ্রুসিক্ত নয়ন প্রভৃতি নির্ম্মলের চক্ষের সম্মুখে এক নূতন রহস্যের অবতারণা করিয়া ধরিয়াছিল। দাওয়ার দিকে ফিরিবা মাত্র বালিকার উপর দৃষ্টি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে মহা বিহ্বল হইয়া পড়িল, সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেগো তুমি,—তুমি কাদের মেয়ে, এই ঝড় বৃষ্টির সময় এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? তোমার বাড়ী কোথায়? একলা যদি চিনে না যেতে পার বল আমায়, আমি তোমায় বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে আসি।"

বালিকা এতক্ষণ অন্ধকারে কেবল মনুষ্যের কণ্ঠস্বরই শুনিতে পাইতেছিল,—কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার চেহারাটা দেখিতে পায় নাই। সে মস্তক তুলিবা মাত্র এইবার নির্ম্মলের সরল সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট দেহটা তাহার চক্ষের উপর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল,—লোকটী বড় দয়ালু,—লোকটী বড় ভালো। সে এতক্ষণ ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল, এইবার একেবারে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া

উঠিল। নিৰ্ম্মল বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া সত্যই বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল,—তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ কেন ভয় কি? যদি বাড়ীর রাস্তা ভুল করে থাক আমায় বলো তোমার বাড়ী কোন পাড়ায়; আমি এখনি তোমার বাড়ী খুঁজে তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি। নাও অমন করে কেঁদনা,—বল তোমাদের বাড়ী কোথায়,—রাস্তা ঘাটে কি কাঁদতে আছে।"

বালিকা ক্ষুদ্র,—তাহার বুদ্ধিটুকু ক্ষুদ্র হইলেও, ভদ্র অভদ্র লোক চিনিবার ক্ষমতাটুকু ভগবান তাহাকে এই বয়সেই দিয়াছিল। নির্ম্মলের কথাগুলা তাহার কর্ণে বড়ই মিষ্ট লাগিল,—সে তাহার মলিন বস্ত্রের মলিন অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলিল, "বাবু আমি বড় দুঃখীর মেয়ে,—মা আমার বড় দুঃখী। আজ ক'দিন থেকে তাঁর অসুখ করেছে। তাই ডাক্তার ডাক্‌তে গেছ্‌লুম,—তা আমাদেরতো পয়সা নেই, তাই ডাক্তারবাবু এলেন না,—বলেন টাকা নিয়ে আয় তবে যাব, আমরা মোটে দুবেলা খেতেই পায়নি টাকা কোথায় পাবো! হাঁ বাবু তাহ'লে কি আমার মা বাঁচবে না?"

নিৰ্ম্মল বালিকার কথাগুলি অবাক হইয়া শুনিতেছিল,

বালিকার প্রত্যেক কথাটি তাহার প্রাণের ভিতর যেন একটা বেদনা সমুদ্রের সৃষ্টি করিতেছিল। 'বাবু মা কি আমার বাঁচবে না,' কি দুঃখের নিশ্বাসে কথাগুলি বালিকার মুখ হইতে বাহির হইল তাহার গুরুত্ব নির্ম্মল প্রাণে প্রাণে বুঝিল। সে ধনির সন্তান,—চিরদিন সুখের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দুঃখীর প্রাণে যে কত ব্যথা লেখাপড়া শিখিয়া সে জ্ঞানটুকু তাহার হইয়াছিল। সে মধুরস্বরে বালিকার কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "চল' আমার সঙ্গে, এখানে আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছেন,—আমি বলে দিলেই তিনি বিনা পয়সাই তোমার মাকে দেখে এসে ওষুধ দেবেন। ভয় কি দু'দাগ ওষুধ খেলেই তোমার মা ভালো হয়ে যাবেন।"

বিনা পয়সায় একজন ডাক্তার তাহার মাতাকে দেখিয়া আসিবে এইটুকু শুনিয়াই বালিকার যেন সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল। সে আজ দুই দিন হইতে শান্তিপুরের প্রত্যেক ডাক্তারের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সকল স্থান হইতেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছে। বিনা পয়সায় কোন চীকিৎসক তাহার মাতাকে দেখিতে যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। বিনা চীকিৎসায়,—বিনা ঔষধে মাতা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে-

ছেন, তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখা বালিকার একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মহা ব্যস্তভাবে বলিল, "বিনা পয়সায় ডাক্তার আমার মাকে দেখ্‌তে যাবে? তবে আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন চলুন। আমি দু'দিন থেকে কত ডাক্তারের বাড়ী বাড়ী ঘুরে এলুম, আমরা গরীব বলে কেউ যেতে চায় না।"

দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিয়া কোমল প্রাণ নির্ম্মলকুমারের আপনা হইতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। শান্তিপুরে সে সবে মাত্র কল্য আসিয়াছে, এখানে কাহার সহিত তাহার পরিচয় নাই। এখানে কোথায় কে ডাক্তার আছে তাহাও তাহার জানা নাই, বালিকাকে কথাটা বলিয়া সে বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ভাবটাকে দমন করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার মধ্যে বড় ডাক্তার কে,—তাকে কি তুমি চেন, তিনি কোথায় থাকেন,—তাঁর বাড়ী তোমার জানা আছে?"

বালিকা একটা সগর্ব্ব দৃষ্টি লইয়া নির্ম্মলের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "এখানকার মধ্যে সব চেয়ে বড় ডাক্তার হ'লেন অঘোরবাবু, আমি তাঁর বাড়ী চিনি। তিনি কি আপনার বন্ধু?"

বালিকার কথায় নির্ম্মলের প্রাণে একটু সাহস হইল, সে একবার তাহার পকেটে হাত দিল, সেখানে চামড়ার মণিব্যাগটায় হাত ঠেকিল। সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "হাঁ, তিনিই আমার বন্ধু,—আমি কলকাতায় থাকি অনেক দিন তার সঙ্গে আমার দেখাশুনা নেই। এখানে আমি মোটে কাল এসেছি, এখানে তিনি যে কোথায় থাকেন তাও আমার জানা নেই। চ'ল তুমি আমায় তার বাড়ীটা দেখিয়ে দেবে, আমি তাকে বল্লেই তিনি তোমার সঙ্গে এখনি তোমার মাকে দেখে আসবেন। ওষুধেরও তোমাদের দাম লাগ্‌বে না, ওষুধ তিনি তোমার মাকে অমনিই দিয়ে দেবেন।"

নির্ম্মলের কথাগুলা দেবতার বাণীর মত বালিকার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, সে দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে বলিল, "আসুন, তার বাড়ী এখান থেকে বেশীদূর নয়, খুব কাছেই। আপনি বুঝি এখানে রাস দেখতে এসেছেন?"

নির্ম্মল কেবলমাত্র বলিল, "হাঁ।"

বালিকা আর কথা কহিল না, দ্রুতপদে অগ্রসর হইল; নির্ম্মলও কোন কথা না বলিয়া বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। জ্যোৎস্নায় পথঘাট বেশ পরিস্কার দেখা যাইতেছে, বায়ু হিল্লোলে বালিকার

রুক্ষ কেশগুলি দুলিতেছে, নির্ম্মল তাহাই দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, সহসা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি ?"

বালিকা চলিতে চলিতেই উত্তর দিল, "আমার নাম তনিমা।"

অনেক কথা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা বেশ একটু ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বালিকা যে ভাবে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মত অবসরটুকু পাইল না, সে নীরবে বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। তিন চারিটা রাস্তা ঘুরিয়া একটা রাস্তার উপর একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বালিকা দাঁড়াইল, সেই বাড়ীটার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই অঘোর ডাক্তারবাবুর বাড়ী।"

বালিকার কথায় নির্ম্মল সেই দিকে চাহিল,—দেখিল বাড়ীখানি নূতন, দরজার পার্শ্বে প্রাচীরের গায়ে পাথরের উপর লেখা রহিয়াছে, "অঘোরচন্দ্র দত্ত, এম, বি,।" নির্ম্মল বালিকাকে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বৈঠকখানা গৃহে কয়েকজন লোক ফরাশের উপর বসিয়া পাশা খেলিতেছিল, নির্ম্মলকে তথায় আসিতে দেখিয়া সকলেই তাহার

মুখের দিকে চাহিল। তাহার ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই কাকে চান ?"

নির্ম্মল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আমি একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই !"

সেই ভদ্রলোকটি সম্মুখ দিকে অঙ্গুলী দেখাইয়া বলিলেন, "ওই সামনের ঘরে যান। ডাক্তারবাবু ওইখানে আছেন।"

নির্ম্মল কোন কথা কহিল না, ভদ্রলোকটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। সেখানে ডাক্তারবাবুর সহিত তাহার কি কথাবার্ত্তা হইল,—ডাক্তারবাবু তাঁহার ভৃত্যকে একখানা গাড়ী আনিতে বলিয়া, ভিতরে কাপড় ছাড়িতে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলকুমার সেইখানে বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। বালিকার অপরূপ রূপ, চলন, বলন, ভাবভঙ্গী সমস্তই ভদ্র বংশের মত। অথচ তাহার বেশভূষা দরিদ্রের মত। বালিকাকে,—কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জানিবার কোন সুযোগই দেখিতে পাইতেছিল না। সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল গাড়ী আসিয়াছে। ডাক্তারবাবু কাপড় ছাড়িয়া তাহার একটু পূর্ব্বেই বাহিরে আসিয়াছিলেন, তিনি নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চলুন।"

নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তারবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইল। বালিকা ব্যাকুল হৃদয়ে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। নির্ম্মলের সহিত ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া একটা আনন্দ-হিল্লোল তাহার প্রাণের উপর দিয়া বহিয়া গেল। নির্ম্মল বাটী হইতে বাহির হইয়া বালিকাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মেয়েটিরই মায়ের অসুখ।"

ডাক্তারবাবুর দেহটা বেশ স্থূল, তাহার আবার নিয়ম ছিল তিনি কোর্ট প্যাণ্ট ব্যতীত রোগী দেখিতে যাইতেন না। তাহার কৃষ্ণবর্ণ থলথলে দেহটা কোট প্যাণ্টে আবদ্ধ হইয়া ঠিক যেন একটা যমদূতের মত দেখিতে হইত। তিনি বালিকার দিকে একবার একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে তোদের বাড়ী কোন পাড়ায় রে ?"

বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "উত্তরপাড়া।"

ডাক্তারবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তাহার ভারে গাড়ীখানার স্প্রীংটা যেন অনেকটা দমিয়া গেল। গাড়ীর একদিকের সব খানিতেও যেন তাঁহার বসিতে কষ্ট হইতে লাগিল। নির্ম্মল বালিকাকে লইয়া গাড়ীর অপর দিকে বসিল। গাড়ী উত্তর-পাড়াভিমুখে ছুটিল। গাড়ীর ঝাকনিতে বালিকার দেহ নির্ম্মলের

দেহে মাঝে মাঝে স্পর্শ হইতে ছিল। তাহাতে তাহার সমস্ত দেহটা একেবারে আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অপরিচিত অজানা বালিকার মূর্ত্তিটুকু অপরিজ্ঞাত ভাবে ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিতেছিল। গাড়ী প্রায় পনোর মিনিটকাল এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া উত্তরপাড়ার ভিতর প্রবেশ করিল। একখানি ভঙ্গ কুটীরে সম্মুখে গাড়ী আসিবা মাত্র বালিকা বলিয়া উঠিল, "এইখানে আমরা থাকি।"

নির্ম্মলকুমার গাড়ওয়ানকে থামাইতে বলিলেন; গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়ী দাঁড়াইবা মাত্র বালিকা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া ডাক্তার আসিয়াছে এই আনন্দ সংবাটকু মাতাকে দিবার জন্য মহা ব্যস্তভাবে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল।

নির্ম্মল ডাক্তারবাবুকে লইয়া কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল। কুটীরের ভিতর একটা তৈল প্রদীপ মিটমিট করিয়া জলিতেছিল, নির্ম্মল তাহারই ক্ষীণ আলোয় দেখিল, বালিকার মাতা একটা অতি মলিন বিছানার উপর পড়িয়া রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। তনিমা গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতার শিয়রের নিকট যাইয়া বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। নির্ম্মল ও ডাক্তারবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মুখ তুলিয়া

চাহিল। ডাক্তারবাবু তাহার স্থূল দেহটা কোনক্রমে রোগীর বিছানার একপার্শ্বে স্থাপিত করিয়া রোগীর হাতটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ, রোগ যে খুব কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। তা চলুন আমার সঙ্গে একটা ওষুধ নিয়ে আসবেন। রাত্রে একদাগের বেশী খাওবাব দরকার নেই। কাল সকাল থেকে তিন ঘণ্টা অন্তর এক দাগ এক দাগ খাওয়াবেন।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নির্ম্মল এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি তাহ'লে তোমার মার কাছে থাক,—আমি এখনি অষুধ এনে দিয়ে যাচ্ছি!"

বালিকা কোন কথা কহিল না। একবার একটা কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি লইয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া, ঘাড়টা কেবল নাড়িল। ডাক্তার-বাবুর সহিত নির্ম্মল কুটীর হইতে বাহির হইল। সে আবার ডাক্তার বাবুর সহিত তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া বালিকার মাতার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করিল,—তাহার পর তথা হইতে সেই গাড়ী করিয়া বাজারের দিকে রওনা হইল। বৃষ্টি ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাগের বাজার বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মল তথা হইতে বালিকার মাতার পথ্যের মত কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আবার সেই কুটীরের দিকে ফিরিল। নির্ম্মল ঔষধ ও পথ্য লইয়া যখন আবার

আসিয়া কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল তখনও বালিকা তাহার মাতার মস্তকের নিকট বসিয়া ব্যাকুল ভাবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। নির্ম্মল কুমারকে কুটিরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মহা ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ওষুধ এনেছেন,—ডাক্তারবাবু কি বল্লেন ;—মা আমার বাঁচবে তো ?"

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাঁচবেন বই কি ? তোমার মারতো ব্যারাম বিশেষ কিছু শক্ত নয়,—জ্বর হয়েছে; এই একশিশি ওষুধ খেলেই ভালো হয়ে যাবেন।"

গাড়োয়ান বেদানা, আপেল, মিছারী প্রভৃতি লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেইগুলো মেঝের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। মূল্যবান মেওয়া সামগ্রী দেখিয়া বালিকা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে বিস্মিতের ন্যায় নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এত টাকার জিনিষ কিনে আনলেন কেন ? আমাদের তো পয়সা নেই আমরা এর দাম কোথেকে দেব ?"

নির্ম্মল মৃদু হাসিয়া বলিল, "এর দাম দিতে হবে না,—আমার বন্ধু তোমার মার পথ্যের জন্যে এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাও একদাগ ওষুধ তোমার মাকে এখন খাইয়ে দাও,—তারপর কাল তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক দাগ করে খাওয়াবে। আমি এখন

চল্লুম, কাল তোমার মা কেমন থাকেন আবার এসে দেখে যাব।"

বালিকা ব্যস্ত ভাবে বলিল, "না, আপনি একটু দাঁড়ান আমি মাকে ঔষুধটা আগে খাইয়ে দিই।"

বালিকা একটা ক্ষুদ্র গ্লাস বাহির করিয়া শিশি হইতে তাহাতে একদাগ ঔষধ ঢালিল,—তারপর আবার শিশিটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া, ঔষধের গ্লাসটা হস্তে লইয়া মাতার শয্যার নিকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। জননী জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় বিছানার উপর পড়িয়া আছেন,—মৃত্যুর ছায়া তাহার মুখে চোখে বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কন্যা জননীর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল, রোগী চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাই ঔষধ গিলিলেন। নির্ম্মল বিহ্বল দৃষ্টিতে এই সকল দেখিতেছিল বালিকার স্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, বালিকা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তবে কখন আপনি আসবেন?"

নির্ম্মল উত্তর দিল, "সকালেই আমি আসবো!"

"দেখবেন আসবেন যেন," বলিয়া বালিকা নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে নির্ম্মল দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিল না,—অবনত মস্তকে তাড়াতাড়ি বলিল, "নিশ্চয়ই আস্‌বো।"

নির্ম্মল কুটির হইতে বাহির হইতেছিলেন সহসা বালিকা আসিয়া

তাহার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে ডাক্তারবাবু নিয়ে এসে ছিলেন কি বলবো,—আমি তো আপনার নাম জানিনি।"

বালিকার স্নেহময় স্পর্শে নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা পুলক স্পন্দনে দুলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কম্পিত কণ্ঠ হইতে আপনা হইতেই বাহির হইল, "আমার নাম নির্ম্মলচন্দ্র রায়।"

বালিকা ধীরে ধীরে তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিল,—নির্ম্মলের মনে হইল দেহের সমস্ত খীলগুলা আল্‌গা হইয়া খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পা দুইটা আর এক পদও অগ্রসর হইল না। তাহার দৃষ্টি প্রাণের ভিতর একটা নূতন ভাবের লহর তুলিয়া বালিকার সরল সুন্দর মুখের উপর একেবারে স্থির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,—এদিক ওদিক চারিদিক কোথাও তাহাকে না দেখিতে পাইয়া ঝড় বৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপেন নিকটেই তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ী ঢুকিয়া পড়িয়াছিল,—ঝড় বৃষ্টি থামিবা মাত্র সে বন্ধুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল কিন্তু প্রায় একঘণ্টা কাল রাসের মেলার প্রতি স্থান সুতীক্ষ্ণ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও বন্ধুর সন্ধান না পাইয়া, শেষ হতাশ ভাবে বাড়ী ফিরিল। সে ভাবিয়াছিল, বাড়ীতে নির্ম্মলের সাক্ষাৎ পাইবে। বৃষ্টি ঝড় দেখিয়া সে নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়াছে,—কিন্তু বাড়ী আসিয়া যখন শুনিল নির্ম্মল তখনও ফেরে নাই, তখন সে তাহার বন্ধুর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে বাহিরের বৈঠকখানা গৃহে বন্ধুর অপেক্ষায়,— বহুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল,—রাত্রি বাড়িয়াই চলিয়াছে,—এত রাত্র পর্য্যন্ত নির্ম্মলের না ফিরিবার কারণ কি,—সে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না সেই সময় তাহার জননী সেই গৃহের ভিতর

প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কইরে উপেন,— তোর বন্ধু এখন ফেরেনি ?"

উপেন জননীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, জননীর কথার ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "কই না, এখনতো ফিরলো না। বিদেশ, এখানকার তো তার কিছুই জানা নেই রাস্তা ভুলে হয়তো পথে পথে ঘুরছে ?"

জননী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পথে পথে ঘুরছে সেকি রে! পাড়া জানে, তোর নাম জানে যাকে জিজ্ঞাসা করবে সেইতো পথ দেখিয়ে দেবে! অত বড় ছেলে এ বুদ্ধিটুকু কি আর নেই। রাসের মেলা দেখা বোধ হয় তার এখন শেষ হয়নি,—কলকাতা থেকে এসেছে সব ভালো করে না দেখে কি আর ফিরবে!"

উপেন বন্ধু এত রাত্র পর্য্যন্ত না ফেরায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, জননীর কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "রাত্তির অনেক হয়েছে,—এত রাত্তির পর্য্যন্ত সে যে একলা রাসের মেলায় ঘুরছে তা বলে আমার বোধ হয় না মা। যা হ'ক আমি আর একবার না হয় রাসের মেলাটা দেখে আসি।"

"আর একটু দেখ যদি আসে, তারপর না হয় বেরুস।" মাতা অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। উপেন গবাক্ষের ভিতর দিয়া রাস্তার দিকে

চাহিয়া বন্ধুর জন্য আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না-লোকে রাস্তায় বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে কোথাও বন্ধুর চিহ্ন নাই। এই ভাবে আরও প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি বন্ধুর দেখা নাই। উপেন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না,—বন্ধুর সন্ধানে জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে কয়েক পদ সবে মাত্র অগ্রসর হইয়াছে সেই সময় একখানা গাড়ী সম্মুখে আসিতেছে দেখিয়া, সে রাস্তা ছাড়িয়া এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল,—গাড়ী তাহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র গাড়ীর ভিতর হইতে আরোহী রোক্ রোক্ বলিয়া উঠিল। সে স্বর নির্ম্মলের। গাড়ী দাঁড়াইতে দাঁড়াইতেও অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। উপেন তাড়াতাড়ি গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সে যাইয়া যখন গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল তখন নির্ম্মল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া গাড়ওয়ানের ভাড়া মিটাইতেছিল। উপেন বন্ধুর নিকটবর্ত্তী হইয়া মহা ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্তির অবধি ছিলে কোথায়,—আমরা তোমার জন্যে ভেবে অস্থির। এত রাত্তির পর্য্যন্ত তুমি ফিরলে না দেখে আমি আবার তোমায় খুঁজতে বেরুচ্ছিলুম।"

নির্ম্মল গাড়ওয়ানের হস্তে গাড়ী ভাড়া প্রদান করিতে করিতে

বলিল, "সে অনেক কথা,—চল বাড়ী সব শুন্‌বে। একেবারে আগাগোড়া রোমান্স।"

উপেন বন্ধুর কথায় বেশ একটু বিস্মিত ভাবে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল; নির্ম্মল মাথাটা নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "সে রাস্তায় শোনবার মত এক কথার জিনিষ নয়। চল বাড়ী,—তারপর একে একে সব শুন্‌বে।"

উপেন কথা কহিল না,—রাত্রি অনেক হইয়াছে, জননী তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন;—সে বন্ধুকে লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। কাজেই রাস্তায় আর বিশেষ কোন কথা হইল না। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নির্ম্মল প্রথমে কথা কহিল; বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "নাও এখন একখানা কাপড় আনাও দেখি,—কাপড়টা ছাড়া এখন সব চেয়ে বেশী দরকার হয়ে পড়েছে।"

উপেনের দৃষ্টি বন্ধুব কাপড় জামার উপর পতিত হইল,—সে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তাতো দেখতেই পাচ্ছি,—এই ভিজে কাপড় পোরে এত রাত্রি পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুর্‌ছিলি কি ব'লে! তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কোন দিনই হবে না।"

নির্ম্মল উত্তর দিল, "তা না হকৃগে,—তুমি এখন একখানা

কাপড় নিয়ে এস তারপর কেন ঘুরছিলুম কি বৃত্তান্ত সব একে একে বল্‌ছি। শুনে তোমাকেও বল্‌তে হবে হাঁ রোমান্স বটে।”

উপেন বন্ধুর কথার আর কোন উত্তর দিল না—একখানা কাপড় আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। নির্ম্মল কাপড়খানা ছাড়িবার জন্য বৈঠকখানা গৃহের চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া বালিকার কথা ভাবিতে লাগিল। বালিকা কে,—কাহার কন্যা কিছুই জানিবার সে অবকাশটুকু পর্য্যন্ত পায় নাই। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্রই এক্ষণে সেইটাই তাহার সর্ব্বাগ্রে জানা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেন তাহার কোন উত্তর নাই। মানুষের প্রাণের রহস্য বুঝিতে পারেন সে কেবল অন্তর্য্যামী। বালিকার শত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত মূর্ত্তিটির অপরূপ শোভা তখনও তাহার চক্ষের সম্মুখে একেবারে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছিল। সে মূর্ত্তিখানি নির্ম্মলের কেবলই মনে হইতে লাগিল, নানাভাবে তাহারই চারিপার্শ্বে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া সুখের রাজ্য পাতিয়া বসিতেছে।

উপেন কাপড় লইয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, “এই নাও, ভিজে কাপড়খানা শিগ্‌গির ছেড়ে ফেল। আমাদের দেশতো তত ভালো নয়,—একে কার্ত্তিক মাস, ভিজে

কাপড় বেশীক্ষণ পরে থাকলে কি আর রক্ষে আছে! শেষে কি একদিনের জন্যে রাশ দেখ্‌তে এসে ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরবে।"

নির্ম্মল বন্ধুর হস্ত হইতে কাপড়খানা লইতে লইতে বলিল, "নিয়ে যে বিশেষ কিছু যেতে পারবো তা বলে আর বোধ হচ্ছে কই,—বরং অনেক জিনিষ রেখে যেতে না হয়।"

নির্ম্মল জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিজে কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিল। উপেন বন্ধুর দিকে চাহিয়া ছিল; বেশ একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "রেখে যেতে হবে সে কি রকম কথা হ'লো?"

নির্ম্মল স্যাতসেতে ভিজে কাপড়খানা ছাড়িয়া বেশ একটু আরাম করিয়া বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া বসিল, গম্ভীর ভাবে বলিল, "তবে আর বল্লুম কি,—আগাগোড়া রোমান্স। ব্যাপারটা বেশ গুরুতর একটু মন দিয়ে শোন, আমি একে একে বলে যাই।"

উপেন আহারের জন্য বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিল, "থাক্ এখন তোমার রোমান্স। মা খাবার কোলে করে আমাদের জন্যে বসে আছেন,—এখন সেটা সারা সব চেয়ে বেশী দরকার হয়ে পড়েছে। তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে বসিয়ে রাখা উচিত নয়,—উঠ আর বসবার দরকার নেই।"

বন্ধুর তাড়ায় নির্ম্মলকে আবার উঠিতে হইল,—সে উঠিতে উঠিতে বলিল, "নিশ্চয়ই মাকে আর কষ্ট দিয়ে বসিয়ে রাখা কিছুতেই উচিত নয়। কিন্তু তুমি যা ভাবছো তা ঠিক নয় আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারি এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। সত্যই আমাকে বেশ একটু কাহিল করে ফেলেছে।"

উপেনও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাব তো ভাববার কিছু নেই, বাপের অগাধ সম্পত্তি, তার ওপর তুমি একমাত্র ছেলে, কাজেই তোমাদের প্রাণে রোমান্সেরও অভাব নেই। চলতো এখন খেয়ে আসা যাক্, তারপর সমস্ত রাত তোমার রোমান্স শোনা যাবে।"

নির্ম্মল আর বন্ধুর কথায় উত্তর দিবার ফাঁক পাইল না,—উপেন অগ্রসর হইয়াছিল, কাজেই তাহাকেও নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। উপেনরা বড় লোক না হইলেও তাহাদের অবস্থা একেবারে খারাপ নহে, তাহাদের দেশে জমিজমার যা আয় ছিল তাহা হইতেই তাহাদের সংসার বেশ সচ্ছলভাবেই চলিয়া যাইত। তাহার পক্ষে যাহা সম্ভব সে তাহার বন্ধুর জন্য সে সমস্তই আয়োজন করিয়াছিল; তাহার উপর উপেনের জননী নিজে বসিয়া একটার পর একটা

সামগ্রী বারবার অনুরোধ করিয়া নির্ম্মলকে খাওয়াইতে লাগিলেন, কাজেই তাহার আহারটা কিছু গুরুতর হইয়া গেল। আহার শেষ করিয়া তাহারা যখন বাহিরে আসিল, তখন রাত্রি একেবারে গভীর হইয়া উঠিয়াছে। রাসের মেলার কলকোলাহল একেবারে নীরব না হইলেও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। স্তব্ধ নীরবতার ভিতর কেবল ঝিঝির বাঁশি বেশ একটা সুরে মাঝে মাঝে বাজিয়া নিশিত রাত্রির নীরবতাকে বেশ একটু চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে।

বাহিরের গৃহে দুই বন্ধুব শয়নের জন্য বিছানা পাতা হইয়াছিল। নির্ম্মল ঘরেব ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে যাইয়া বিছানার উপর আড় হইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল ;—সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত বালিকার অপরূপ মূর্ত্তিখানি যেন মায়ালোকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমোদ প্রমোদ লেখাপড়ার ভিতর দিয়াই নির্ম্মলের জীবনস্রোত বেশ হাল্‌কা ভাবে এতকাল বহিয়া আসিতেছিল, আজ যেন সেটা চড়ায় ঠেকিয়া একেবারে রীতিমত ভারী হইয়া দাঁড়াইল। যেন একটা নূতন রাজ্যের আভাস পাইয়া তাহারই সন্ধানে সমস্ত প্রাণটা একেবারে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল এ অবস্থায় চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকা নির্ম্মলের একেবাবে দুরূহ হইল, সে একটা

বেশ বড় রকম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল। উপেন তাহার পার্শ্বে বসিয়া পান চিবাইতেছিল; বন্ধুর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্রই সে ফিরিয়াছিল। বন্ধুকে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিতে দেখিয়া বেশ একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি ব্যাপার কি হে? ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যে! প্রাণটা কি শান্তিপুরেই রেখে যেতে হ'লো নাকি?"

নির্ম্মল ঘাড়টা নাড়িয়া বলিল, "কতকটা যেন সেই রকমই গতিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। না আমায় এতদিনে দেখছি বেশ একটু বাবু করে ফেল্‌লে।" ভালবাসাটা যে বিচিত্র ব্যাপার সেটা যে একটা হাসি ঠাট্টার জিনিষ নয়, তার কতকটা আভাস বেশ যেন একটু টের পাচ্ছি।

"তাই নাকি!" উপেন বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শান্তিপুরে এসে কোথায় শান্তি পাবে না কতকগুলো অশান্তি প্রাণের ভিতর ঢুকিয়ে ফেল্‌লে। এখন ব্যাপারটা কি একটু ভেঙ্গেচুরে বলো দেখি। এই বৃষ্টি ঝড়, যখন মানুষ ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌ছিলো, তখন তোমার প্রাণে হঠাৎ রোমান্স এলো কেমন করে তার তো আমি খেই পাচ্ছিনি।"

নির্ম্মল নিজেকে বেশ একটু জুত করিয়া লইয়া, বালিকার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইতে ডাক্তার লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত একে একে সব কথাই বন্ধুকে বলিয়া ফেলিল। বালিকা যে সত্যই সুন্দরী এ কথা বলিতেও তাহার ভুল হইল না। শেষ সে উপেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাই আমি যদি বলি, আমি সেই মেয়েটিকে একটুও ভালো বাসিনি তাহ'লে সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য কথা বল্‌তে কি আমি সেই মেয়েটিকে দেখা মাত্রই কেমন যেন একটু ভালো বেসে ফেলেছি।"

বন্ধুব কথায় একটা যেন বিদ্রুপের হাসি উপেনের মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ খুব ভালো, কে কি বৃত্তান্ত কার মেয়ে কিছুই জাননা, অথচ বলে বস্‌লে ভালো বেশে ফেলেছি। ভালো বাসাটা কি এতই সোজা হে। যে স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই অমনি ভালো বাসলেই হ'লো। ওকে ভালোবাসা বলে না, ওটা হ'লো কি জান মনের ব্যামো। ব্যামো হ'লে যেমন চীকিৎসার প্রয়োজন হয়, সেই রকম ওরকম ভালোবাসা হ'লে চীকিৎসার দরকার।"

নির্ম্মল গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু ব্যামোতো মানুষ ইচ্ছে করে ক'রে না, সে যখন হয় তখন আপনিই হয়।"

উপেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "ব্যামো যে ঠিক আপনি হয় তা নয়। নিজের দেহের ওপর যার যত দৃষ্টি বেশী তার তত ব্যামোও কম। যাক্ ওসব জিনিষকে বেশী ঘাটাঘাটি করা ভালো নয়। যেটুকু হয়েছে সেইটুকুই ভালো, ওইখানেই ইতি দিয়ে শেষ করে ফেলো।"

নির্ম্মল একটা বড় রকম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ইতিতো কর্ত্তেই হবে, তবে কাল সকালে একবার তাদের বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন। মেয়েটিকে আমি কথা দিয়ে এসেছি, সে আমার জন্যে আশা করে বসে থাক্‌বে না যাওয়া একেবারেই ভদ্রতার বিরুদ্ধ তা ছাড়া তার মার অবস্থা যা দেখে এসেছি তাতে তার বাঁচবার আশা খুব অল্পই। এ অবস্থায় একটা ক্ষুদে মেয়ের প্রাণে ব্যথা নিয়ে কি আমি অনন্তকাল নরকে পচে মরবো?"

নির্ম্মলের কথাবার্ত্তার ওজন শুনিয়া উপেন বেশ বুঝিয়াছিল, —বন্ধুর অবস্থা বড় ভালো নয়। অর্থের সাচ্ছল্যের ভিতর দিয়া প্রথম যৌবন যখন গা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠে তখন মানুষের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। প্রাণের ভিতর সোনার দেশের নূতন হাওয়া বহিতে থাকে। সে সময় নিজেকে স্থির রাখা বড়ই কঠিন। নির্ম্মলের অর্থের অভাব নাই,—

সে পিতার একমাত্র পুত্র, যৌবন এই সবে মাত্র গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে,—এ সময় যদি সে সতর্কতার সহিত পা না ফেলে তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। তাহাদের দেশে আসিয়া তাহার বন্ধু যে পতনের মুখে অগ্রসর হইবে তাহা কিছু-তেই হইতে পারে না। উপেন নির্ম্মলকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "সেও ভালো, অনন্তকাল নরকে পচে মরাও ভালো তবু মনের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যেতেই পারে না। আর সেখানে যাওয়া তোমার কিছুতেই হ'তে পারে না,—আর যাবেই বা কখন আমাদের কাল ভোরের ট্রেনেই কল্‌কাতায় রওনা হতে হবে। দু'দিন কলেজ কামাই হয়ে গেছে আর পারসেণ্টটেজ নষ্ট করা হ'তে পারে না। মোট কথা আমি তোমায় কিছুতেই আর সেখানে যেতে দিতে পারিনি।"

নির্ম্মল বন্ধুর দিকে একবার চোখটা তুলিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন,—অপরাধ? অনাহারে অচীকিৎসায় একজন মরছে, তার চীকিৎসা করা যদি অন্যায় হয় তাহ'লে ন্যায় যে কি তাতো বল্‌তে পারিনি।"

উপেন বেশ একটু উৎত্তেজিত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল, "দোষের হত না,—যদি ওই মেয়েটা একরাশ রূপের বোঝা নিয়ে

তোমার সম্মুখে না দাঁড়াত। আমার বাড়ী একদিনের জন্যে এসে শুধু শুধু একটা অশান্তি প্রাণে পুরতে আমি কিছুতেই তোমায় দিতে পারিনি,—কাল তোমায় আমার সঙ্গে সকালেই কলকাতায় যেতে হবে, তারপর তুমি যদি আমার কথা না শোন নিজে একলা আসতে পারো। তবে যদি বন্ধুর পরামর্শ শোন ও রাস্তা দিয়ে তোমার আর হাটা উচিত নয়।"

নির্ম্মল বন্ধুর কথায় আর কোন উত্তর দিল না শয্যার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আড় হইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া নির্ম্মলকে পরদিন প্রত্যুষে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল,—উপেন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে চাহিল না। হয়তো জোর করিলে নির্ম্মল থাকিতে পারিত কিন্তু প্রাণের দুর্ব্বলতা যাইবে কোথায়,—কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার সে পথও রোধ করিয়া দিল। সে বন্ধুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল বটে কিন্তু প্রাণটা শান্তিপুরে পড়িয়া রহিল। প্রাণ শূন্য দেহ খাড়া থাকা অসম্ভব,—কলিকাতায় আসিয়া যথা সময়ে সে কলেজে গেল,—কিন্তু কলেজে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। পুস্তক খুলিবা মাত্র বালিকার সেই মূর্ত্তিখানি যেন পাতায় পাতায় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। সে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানার উপর চক্ষু বুঝিয়া পড়িল; এক্ষণে কি করা উচিত অনুচিত তাহারই আকাশ পাতাল চিন্তায় তাহার সমস্ত প্রাণটা কানায় কানায় উছলিয়া উঠিল। সে নানা ভাবে তাহার দুর্ব্বল

মনকে সবল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই মনটাকে চাঙ্গা করিতে পারিল না। যেন একটা রোলার ইঞ্জিন বিভৎস শব্দে তাহার সমস্ত বুকটা দলিয়া পিসিয়া মন্থর গমনে চলিতে লাগিল। ফুলসাজে সজ্জিত নবীন দেবতা কখন কি ভাবে কাহার উপর আবির্ভাব হন তাহা কৈলাসনাথ যোগীশ্বর মহাদেবেরও বুঝা অসম্ভব। তিনি একবার আসিয়া দর্শন দিলে,—আর মানুষের ভালো মন্দ বুঝিবার সমস্ত ক্ষমতাই লুপ্ত হইয়া যায়,—তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে এক মায়ার আলো জ্বলিয়া উঠে,—সেই আলোর চতুরপার্শ্বে সমস্ত প্রাণটা কেবলই ঘুরাইতে থাকে। কর্ম্মের বোঝার চাপে সে আলো নিবিয়া যায় না,—চক্ষের জলে সে আলো নিবিবার নয়। সে আলো একবার প্রাণের মাঝে জ্বলিয়া উঠিলে জীবনে একেবারে নিবিবার অতি অল্প সম্ভাবনা। নির্ম্মলের প্রাণে সেই আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে বন্ধুর একটী মাত্র যুক্তির কথায় কি তাহা নিবিতে পারে,—সে দুই দিন প্রাণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া কোন ক্রমে কাটাইল কিন্তু তিন দিনের দিন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সকালে সে কলেজ যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিল কিন্তু প্রাণের যাতনায় অস্থির হইয়া সে ঘুরিতে ঘুরিতে সেয়ালদহ ষ্টেসনে যাইয়া উপস্থিত

হইল। ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল শান্তিপুরের গাড়ী ছাড়িতেছে,—তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে বিদ্রোহ হইয়া উঠিল, সে আর ভাবিতেও অবসর পাইল না,—তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

নির্ম্মলের পিতা রঘুনাথবাবু কুষ্টিয়ার মধ্যে একজন বেশ নাম করা জমিদার। রঘুনাথবাবুর একটী কন্যা ও একটী পুত্র। গত বৎসর কন্যার বিবাহ দিয়াছেন,—সম্প্রতি পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন। নির্ম্মল কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, পড়িতেছিল। রঘুনাথবাবু পুত্রের জন্য কলিকাতায় একখানি স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া তাহার এক মাত্র পুত্র নির্ম্মলের লেখা পড়ার যাহাতে কোন রূপ অসুবিধা না হয় সে জন্য তিনি অর্থ ব্যয়ের কোনরূপ কুণ্ঠা রাখেন নাই। তাঁহার যত্নে নির্ম্মলও সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ছিল। মাঝে মাঝে দেশে আসিলে পাছে পুত্রের লেখা পড়ায় বিঘ্ন ঘটে সেই আশঙ্কায় তিনি প্রায়ই নিজে আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার পত্নী বাসনাদেবী যখন একমাত্র পুত্রকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন তখন তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া

আনিতে বিস্মৃত হইতেন না তথাপি পড়ার ক্ষতি করিয়া পুত্রকে কোন দিনও দেশে আসিতে বলিতেন না। নির্ম্মলও পড়া ক্ষতি করিয়া এক দিনের জন্যও কলিকাতা ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই। কুক্ষণে সে শান্তিপুরে রাস দেখিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে প্রাণের ভিতর যে আগুন জ্বালিয়া আনিয়াছে তাহাতে তাহার লেখাপড়া সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাব প্রশান্ত হৃদয় শান্তির স্রোতের ভিতর দিয়া তরতর করিয়া বহিয়া আসিতেছিল সহসা যেন একটা পর্ব্বতের ধাক্কা খাইয়া একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে। অশান্তির সেওলা ঠেলিয়া তাহা যেন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পিতা যখন লাল টুকটুকে বৌ আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন পুত্র তখন নিজের বধূ নিজেই ঠিক করিতে শান্তিপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

কলিকাতা হইতে যথা সময়ে ট্রেন যখন যাইয়া শান্তিপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল তখন মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড কিরণে সমস্ত শান্তিপুরটা একেবারে ঝলসাইয়া দিতে ছিল। গাড়ী থামিবামাত্র নির্ম্মল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সে কেবল একটা পাঞ্জাবী পরিয়াই শান্তিপুরে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছে। পায়ে তাহার চটি জুতা মাত্র, হাতে একখানা নোট লিখিবার খাতা। এই প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে খাতাখানা মস্তকের উপর তুলিয়া ধরিয়া রৌদ্রের হস্ত হইতে মাথাটাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপরেই কয়েক জন ভাড়াটে গাড়ীর গাড়ওয়ান আরোহী সংগ্রহের চেষ্টায় ছুটাছুটি করিতেছিল, নির্ম্মলকে ট্রেন হইতে নামিয়া প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কয়েকজন তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় যাবেন,—গাড়ী চাই কি ?"

বালিকা ডাক্তারকে বলিয়াছিল, আমাদের বাড়ী উত্তরপাড়া নির্ম্মল সে কথাটুকু ভুলে নাই। সে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ গাড়ী চাই, উত্তরপাড়া যেতে হবে।"

চারি পাঁচজন গাড়ওয়ান একেবারে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আসুন বাবু আমার গাড়ীতে ছ'আনায় পৌঁছে দেব।"

বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল,—গাড়ওয়ানদিগের সহিত দর দস্তুর করিবার তাহার মোটেই অবসর ছিল না। সে প্লাটফরম হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে যে গাড়ীখানা দেখিল তাহাতেই উঠিয়া

বসিল। গাড়ওয়ান উত্তরপাড়াভিমুখে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। একাকী গাড়ীতে বসিয়া নির্ম্মলের শত কথা প্রাণের ভিতর ধীরে ধীরে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। পরদিন প্রত্যুষেই সে নিশ্চয়ই আসিবে বলিয়া বালিকাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাহাকে পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইয়াছিল,—আজ বালিকা যখন জিজ্ঞাসা করিবে,—সে তাহার কি উত্তর দিবে? সে বালিকার মাতার অবস্থা যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা ছিল,—যদি তাঁহার ভালো মন্দ কিছু হইয়া থাকে তাহা হইলে অসহায় বালিকার অবস্থা কি হইয়াছে! মাতার সৎকার করিবার পয়সাও তো তাহার নাই। হয়তো মৃত জননীর দেহ কোলে করিয়া কেবলই অশ্রুজলে ভাসিয়াছে কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই,—দীনের কাতর ক্রন্দন বেদনার ঝটিকায় বুকের ভিতর কেবল নিরাশার তুফান তুলিয়াছে।

এই সকল চিন্তার ভিতর নির্ম্মলের প্রাণটা একেবারে ডুবিয়াছিল,—সহসা রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল গাড়ী সেই কুটিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যেন একটা কিসের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল,—সে তাড়া-

তাড়ি কম্পিত কণ্ঠে গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ী থামিল,—নির্ম্মল গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ওয়ানকে ভাড়া দিয়া ভগ্ন কুটিরের ভগ্ন দ্বারের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। কুটিরের ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বেশ একটু আকুল আগ্রহে কুটিরের ভিতর উকি-ঝুকি দিতে লাগিল। কিন্তু কুটিরের ভিতর কাহার কোন সাড়া শব্দ পাইল না। চারিদিক রৌদ্রে কাট ফাটিতেছে,—রাস্তায় লোকজন নাই বলিলেই হয়,—বালিকা এখনি বাহির হইবে এই আশায় নির্ম্মল সেই কুটিরের দ্বারে কম্পিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু কেহই কুটিরের ভিতর হইতে বাহির হইল না। বালিকার নামটুকু নির্ম্মল ভুলিয়া যায় নাই,—সে নামটুকু তাহাকে যেন আকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন কাহাকেও কুটির হইতে বাহির হইতে দেখিল না তখন প্রাণে বেশ একটু সাহস সঞ্চার করিয়া অতি মৃদু স্বরে ডাকিল, "তনিমা—তনিমা!"

ভিতর হইতে কোনই উত্তর আসিল না,—কেবল প্রতিধ্বনি নিরাশার আঁধারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহার কাণের পাশ দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া গেল। নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল,—বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে

অসম্ভব হইল,—সে ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া কুটিরের ভিতর প্রবেশ করিল। শূন্য কুটির পরিত্যক্ত শ্মশানের মত হাহাকার করিতেছে,—কোথায়ও কেহ নাই। কেবল তনিমার জননী যে মলিন শয্যার উপর পড়িয়া রোগ যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছিলেন সেটা বক্ষে ধারণ করিয়া কুটিরখানি যেন তখন পর্য্যন্ত তাহাদের স্মৃতিটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে। কুটিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুটিরের অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলের চক্ষের সম্মুখে জগতের সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়াছিল। ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবী যে ভাবে দুলিয়া উঠে ঠিক সেইভাবে তাহার সমস্ত দেহটা দুলিতে লাগিল। কুটিরের অবস্থা দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। তনিমার জননী যে মারা গিয়াছে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। মাতার মৃত্যুর পর অসহায়া,—অনাথিনী বালিকা বেদনার বোঝা বুকে লইয়া সংসার সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে,—সে আর জীবিত আছে কিনা সন্দেহ! শেষ বন্ধন ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বালিকার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে উপায়হীনা বালিকা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার কেবল মাত্র একটুখানি দুর্ব্বলতার জন্য দুইটি প্রাণ কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে এইটুকু ভাবিয়া একটা মহা

ধিক্কারে নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। সে আর তথায় দাঁড়াইতে পারিল না, উন্মত্তের মত কুটির হইতে বাহির হইয়া একেবারে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় এক-জন প্রাচীন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন,—নির্ম্মলকে পাগলের মত শূন্য কুটির হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। নির্ম্মলের বেশভূষা,—ভাব ভঙ্গি ভদ্রবংশের মত দেখিয়া তিনি বেশ একটু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। নির্ম্মল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র তিনি বেশ একটু অবাক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই কোথায় গেছ্‌লেন,—ও কুড়ের ভেতর তো কেউ নেই।"

নিরাশার আঁধার বুকের ভিতর বোঝাই করিয়া নির্ম্মল পাগ-লের মত ছুটিয়া কুটিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল,—সম্মুখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া বেশ একটু কিন্তু ভাবে থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃদ্ধের কথা গুলা বোধ হয় তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করে নাই। সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই এখানে যারা ছিলেন, তারা কোথায় গেছেন বল্‌তে পারেন?"

বৃদ্ধ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "না—আজ দু'দিন হ'লো তারা

এখান থেকে চলে গেছে,—কোথায় যে গেছে তাতো বলতে পারিনি। একটা ভিখিরী মেয়ে আর তার মা এখানে থাকতো। তাদের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন? তাদের সঙ্গে কি আপনার কোন—"

নির্ম্মল বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ,—তারা আমার বিশেষ আত্মীয়। আমি বহুদিন এদেশে ছিলুম না, এখানে এসে তাদের দুঃখের কথা শুনে তাদের নিয়ে যেতে এসেছিলুম,—কিন্তু কই তারাতো এখানে নেই।"

নির্ম্মলের কথায় বৃদ্ধ লোকটী বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ভগবান তাদের বরাতে দুঃখ লিখেছেন, তাদের সুখী করা কি মানুষের সাধ্য। এই কুঁড়ে ঘরখানায় আজ প্রায় এক বৎসর তারা বাস করছিলো কিন্তু দেখনা কেমন ভগবানের চক্র, আপনি আসবার আগের দিনই তারা চলে গেল। ওই মুদির দোকানটায় জিজ্ঞাসা করে দেখুন দেকি যদি তাদের কিছু বলে গিয়ে থাকে।"

নির্ম্মল কোন উত্তর দিল না,—কেবল একবার ঘাড়টা ফিরাইয়া মুদির দোকানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধও আর কোন কথা না বলিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। নির্ম্মল একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুদির দোকানের দিকে অগ্রসর

হইল। মুদির দোকানেও বালিকার কোন সন্ধান হইল না,—বালিকা যে তাহার মাতার সহিত কোথায় গিয়াছে, তাহারাও তাহা জানে না,—বালিকাকে তাহার মাতার সহিত কুটির ছাড়িয়া তাহাদের দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে বটে কিন্তু কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক না হওয়ায় তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। তবে নির্ম্মল তাহাদের নিকট এইটুকু জানিলেন যে, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাল বৈকালে একখানা গাড়ী আনিয়া তাহাদের লইয়া গিয়াছেন।

নির্ম্মল মুদির দোকানে আর বিশেষ কিছু সন্ধান পাইবার আশা নাই দেখিয়া তথা হইতে বাহির হইল। তাহার পর সারাদিন শান্তিপুরময় যতদূর সম্ভব বালিকার অনুসন্ধান করিল,—কিন্তু বালিকার কোনই সন্ধান হইল না। দুঃখীর সংবাদ কেহই রাখে না, রাখিবার আবশ্যকও মনে করে না। সমস্ত দিন সমস্ত শান্তিপুরময় বালিকার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধ্যার সময় হতাশ হৃদয়ে নির্ম্মলকুমার কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া তাহার দেহটা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল। সে ট্রেনে উঠিয়া গবাক্ষ

উপাদানে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ট্রেন শত পল্লী পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিয়াছে, বাতাস হু হু শব্দে আসিয়া তাহার মাথার উপর লুটাইয়া পড়িয়া তাহাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্ম্মল একটু নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু চোখে নিদ্রা আসিল না, বালিকার সেই করুণ স্বর কেবলই যেন তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল, "দেখ্‌বেন আস্‌বেন তো?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—এই দুই বৎসরেব ভিতর নির্ম্মলের জীবনের অনেক পরিবর্ত্তণ ঘটিয়াছে,—কিন্তু সে আজও সেই বালিকাকে ভুলিতে পারে নাই,—সে মূর্ত্তি আজও তাহার চক্ষের সম্মুখে ঠিক সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছে। এই দুই বৎসর সে বালিকার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে কিন্তু কোনই সন্ধান মেলে নাই। নির্ম্মল বালিকার সাক্ষাৎ না পাইয়া যে দিন শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আইসে তাহার কিছুদিন পরেই তাহাব পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতার শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ করিয়া এই দুই বৎসর কাল সে বিদেশে বিদেশে ঘুরিতেছিল, সম্প্রতি একমাসও হয় নাই দেশে ফিরিয়াছে।

পল্লীগ্রাম,—রজনীর অন্ধকার হু হু করিয়া গৃহের ভিতর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল,—ভৃত্য আসিয়া গৃহে আলো দিয়া গেল। নির্ম্মলকুমারের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, সে গৃহ প্রাচীরস্থিত পিতার তৈলচিত্রখানার দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। এই দুই বৎসর বিদেশে বিদেশে সে কেবল একটা ভাবনা লইয়াই

ঘুরিতেছিল কিন্তু দেশে ফিরিয়া পর্য্যন্ত তাহার ভাবনা দুইটা হইয়াছে। বিদেশে কেবল বালিকার চিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল কিন্তু দেশে ফিরিয়া নায়েব মহাশয়ের নিকট জমিদারীর হিসাব নিকাশের কথা শুনিয়া তাহাকে আবার সে ভাবনাটাও ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দেশ হইতে সুদূর বিদেশ কলিকাতায় সে আবাল্য মানুষ হইয়াছে,—জমিদারী কি,—জমিদারী কেমন করিয়া চালাইতে হয় তাহার কিছুই সে বুঝে না,—জানে না। কিন্তু না বুঝিলে নয়,—এখনও পিতার বৃদ্ধ কর্ম্মচারিগণ জীবিত রহিয়াছে,—এই বেলা সব দেখিয়া শুনিয়া না লইলে ভবিষ্যতে কিছুই জানিবার উপায় থাকিবে না। নির্ম্মল নিজের শয়ন গৃহটির ভিতর পড়িয়া পড়িয়া এই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিল,—কিন্তু চিন্তার কোনই মীমাংসা করিতে না পারিয়া সে যেন একেবারে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সেই সময়ে তাহার জননী আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অতি মধুর স্বরে ডাকিলেন, "নিমু,—এই অন্ধকারে কি বাবা এমন করে পড়ে থাক্‌তে হয়। দু'বছর তো দেশ বিদেশে ঘুরলি,—এতদিন পরে যখন দেশে এসেছিস্ এখন আর বসে থাক্‌লে চল্‌বে কেন বাবা। নিজের বিষয় সম্পত্তি নিজে না বুঝে নিলে

কি হয়? কোথায় কোন্ মহাল আছে, এই বেলা সব দেখে শুনে আয়। বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত তো একবারও বাড়ীর বার হলিনি,—এমন আলিস্যি কল্লে কি আর জমিদারী থাকে? আর উড়ে উড়ে ভেসে ভেসে বেড়াস্‌নি—এইবার একটা বিয়ে-থা ক'রে থিতুভিতু হ'।"

নির্ম্মলের মাতা বাসনাদেবীর বয়স অধিক নহে,—চল্লিশের মধ্যে বলিয়াই বোধ হয়,—তাঁহার গঠনটা রোগাও নহে, মোটাও নহে, মাঝামাঝি। মুখখানি দেখিতে সুশ্রীও নহে, কুশ্রীও নহে চলন সহি। তাহাকে দেখিলে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়াই বোধ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর এই দুই বৎসর কাল তিনি নিজেই জমীদারীর কাজ কর্ম্ম দেখিতেছিলেন। নির্ম্মল জননীর স্বরে ঘাড় ফিরাইয়াছিল,—একবার জননীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "মা—এত দিন বিদেশে বিদেশে ঘুরে কেমন যেন একটু আলসে হ'য়ে পড়েছিলুম। কাল থেকে জমিদারীর কাজ কর্ম্ম আমি নিজেই দেখবো। নায়েব মশাইকেও সেই কথাই বলে দিয়েছি।

পুত্রের কথায় জননীর প্রাণে যেন একটা শান্তি আসিল। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের উড়ো উড়ো ভাব দেখিয়া তিনি একটু

বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রের উদাস ভাব,—কোন কাজে গা নাই প্রভৃতি লক্ষণ তাঁহার বুকের মধ্যে চিন্তার সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি কেমন করিয়া পুত্রকে একটু স্থিতু করিয়া তাহার বিষয় সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবেন তাহার কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। পুত্র নীবব হইবা মাত্র বলিলেন, "হাঁ, নিজের জমিদারী নিজে সব দেখে শুনে নে,—তারপর একটা দেখে শুনে বিয়ে করে একটু থিতু-ভিতু হ। তুই আমার সবে মাত্র ছেলে, তুই যদি এমন উড়ু উড়ু করিস্ তা হলে কি নিয়ে প্রাণ ধরে থাকি বল?"

কেন যে নির্ম্মল আজ দুই বৎসর হইতে উড়ু উড়ু করিয়া বেড়াইতেছে, জননী তাহার কিছুই জানেন না। উপেনের সহিত নির্ম্মলের আজ বহু দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই,—পিতার মৃত্যুর পর সে কেবল মাত্র একবার কলিকাতায় গিয়াছিল,—তাহার পর পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উঠাইয়া চলিয়া আসিয়াছে,—আর এই দুই বৎসরেব ভিতর এক দিনের জন্যও কলিকাতায় যায় নাই,—উপেনেরও কোন সংবাদ পায় নাই। সে এখন পড়া শুনা করিতেছে না, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে তাহাও সে জানে না। নির্ম্মল তাহার জননীর কথার কোন উত্তর

দিল না,—জননী আবার বলিতে লাগিলেন, ওঁর বন্ধু সদরের উকীল বরদাবাবুকে তোর জন্যে একটা পাত্রী দেখ্‌তে বলেছিলুম,—তোর জন্যে একটা পাত্রী ঠিক করে আজ তিনি খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন। সদর থেকে একখানা চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। তিনি লিখেছেন, নির্ম্মলকে সুবিধা মত দুই চারি দিনের জন্য তাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেই তিনি মেয়েটী তাহাকে দেখাইয়া দিবেন। মেয়েটী নাকি ভারি সুন্দরী,—বাপের মস্ত জমিদারী,—তবে দোষের মধ্যে মা বাপ নেই এই যা। তা নইলে আর কোন দোষ নেই। যা এক দিন ববদাবাবুর সঙ্গে দেখা কর ?"

বিবাহের কথায় বালিকার স্মৃতিটা যেন নাড়াচাড়া খাইয়া আরও উজ্জল হইয়া উঠিল,—জননীর কথার উত্তরে নির্ম্মল অতি মৃদু স্বরে বলিল, "বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কি আছে মা ? বিষয় সম্পত্তিগুলো দেখে না নেওয়া পর্য্যন্ত বিয়ে না করাই ভালো। আগে মহল টহল থেকে ঘুরে আসি তারপর বিয়ে কল্লেই হবে। আপাততঃ মা কিছু দিন, বিয়ে টিয়ে স্থগিত রাখলেই ভালো হয়।"

নির্ম্মলের জননী বাসনাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না বাবা আর বিয়ে না কল্লে কি ভালো দেখায়। বরদাবাবু

তোর বিয়ের জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাঁর বিশেষ ইচ্ছে তোর বিয়েটা যাতে এ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়। ওনি মরবার সময় তোর সমস্ত ভার বরদাবাবুর ওপরেই দিয়ে গিয়েছেন,—তাঁর যখন ইচ্ছে তখন তোর এই মাসের মধ্যেই বিয়ে করা উচিত। তার চিঠিখানা নিয়ে আসি দেখ, চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবি তোর বিয়ের জন্যে তিনি কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

জননী বরদাবাবুর চিঠিখানা আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নির্ম্মল ভাবনায় অনন্ত তুফানের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। বালিকার স্মৃতিটুকু হৃদয় হইতে না মুছিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ করা অসম্ভব,—সে কিছুতেই অপরকে বিবাহ করিতে পারে না। বালিকা যে এক মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের সবখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে,—সেখানে অপরের স্থান হইবার আর একটুও ফাঁক নাই। বিবাহ চিন্তায় নির্ম্মলের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া উঠিয়াছিল, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু জননীর পদ শব্দে আবার তাহাকে চক্ষু মেলিতে হইল। তিনি নির্ম্মলের নিকটে আসিয়া বরদাবাবুর পত্রখানা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "চিঠিখানা পড়ে দেখ, ববদাবাবু

আমাদের মহা হিতাকাঙ্ক্ষী লোক,—যাতে তোর মন্দ হবে তেমন কাজ তিনি কখনই তোকে কর্ত্তে বল্‌বেন না। তাঁর কথা অবহেলা করিস্‌নি।”

নির্ম্মল জননীর কথার কোন উত্তর দিল না,—সে লেফাফা হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

শ্রীযুক্তেশ্বরী!

পরে নির্ম্মলের বিবাহের জন্য একটী পাত্রীর কথা যাহা আপনি আমার উপর ভার দিয়াছিলেন। এতদিন সুবিধামত পাত্রীর কোন সন্ধান না পাওয়ায় আপনাকে কোন সংবাদ দিতে পারি নাই। সম্প্রতি নির্ম্মলের জন্য একটী পাত্রী স্থির করিয়াছি। পাত্রীটি আমার এক ধনবান মক্কেলের কন্যা। কন্যার পিতা মাতা কেহই জীবিত নাই,—পিতার বিস্তৃত জমিদারীর সেই কন্যাই এক্ষণে একমাত্র মালিক। কন্যা ও কন্যার বিস্তৃত জমিদারীর সমস্ত ভার এক্ষণে আমার উপরই রহিয়াছে। কন্যাটি পরমা সুন্দরী, আমার মতে ইহারই সহিত নির্ম্মলের বিবাহ দেওয়া উচিত। আজ দুই বৎসর ধরিয়া নির্ম্মল বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—এ অবস্থায় আর তাহার বিবাহে বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এইবেলা স্থিতুভিতু হইয়া নিজের

বিষয় সম্পত্তি নিজে না বুঝিয়া লইলে পরে মহা গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার বিশ্বাস বিবাহ হইলেই নির্ম্মলের অস্থির চিত্ত কতকটা নিশ্চয়ই শান্ত হইবে। অতএব বিবাহটা যাহাতে এই মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয় আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সুবিধা মত দুই চারিদিনের মধ্যেই নির্ম্মলকে একদিন আমার এখানে পাঠাইয়া দিবেন,—আমি মেয়েটিকে তাহাকে দেখাইয়া দিব। মেয়েটিকে অপচন্দ করিবার মত কিছুই নাই, দেখিলে নিশ্চয়ই তাহার পছন্দ হইবে।

আপনার নিকট সংবাদ পাইলে তবে আমি কন্যা পক্ষের নিকট সংবাদ দিব। নির্ম্মল কবে নাগাত আসিতে পারে, পূর্ব্বে একটু সংবাদ দিবেন। এবাটীর সংবাদ মঙ্গল,—মঙ্গল সংবাদদানে চিন্তা দূর করিবেন। ইতি :—

বশংবদ—

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র।

পুঃ—আমার মক্কেল কন্যা তনিমাও বিবাহ বয়সে উপনীত হইয়াছে, এই মাসের ভিতর তাহারও বিবাহ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এতক্ষণ নির্ম্মল বেশ সুস্থির হৃদয়ে পত্রখানা পাঠ করিয়া

আসিতেছিল, আমার মক্কেল কন্যার নাম তনিমা পাঠ করিবা মাত্র তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মক্কেলের নাম তনিমা! আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে সে বালিকার মুখে শুনিয়াছিল, 'আমার নাম তনিমা' সে নামটুকু যে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, সে নামের ধ্বনি নিশিদিন যে তাহার কাণের পার্শ্বে বাজিতেছে। এতদিন পরে আবার সেই নাম! এই তনিমা কি তাহার সেই তনিমা। না-না তাহা কেমন করিয়া হইবে; সে যে অনাহার প্রপীড়িতা ছিন্ন বসনা ভিখারীর কন্যা, আর এ যে সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিতা জমিদার কন্যা। নির্ম্মল নামটা তিন চারিবার পাঠ করিল, নামের ধ্বনিতে তাহার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চিঠিখানি মুড়িয়া লেফাফাটার ভিতর পুরিয়া জননীর হস্তে ফিরাইয়া দিল। জননী পত্রখানা হাতে লইতে লইতে বলিলেন, "কবে যাবি বল,—আমি সরকার মশাইকে দিয়ে সেই মত বরদাবাবুকে লিখে পাঠাই।"

এ তনিমা সে তনিমা নয়,—তথাপি এ তনিমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা নির্ম্মলকুমারের প্রাণের ভিতর বেশ একটু তাল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। পাত্রী দেখিতে গেলেই যে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে এমন কোন মানে নাই, তবে একবার

তাহাকে দেখিয়া আসিতে ক্ষতি কি? জননীর কথার উত্তরে নির্ম্মল ঘাড়টা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার তো মা রোজই সুবিধে যে দিন বলবেন সেই দিনই পাত্রী দেখে আসবো। পাত্রী দেখ্‌তে আর আপত্তি কি?"

বাসনা দেবী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "নায়েব মশাই একবাব বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

নির্ম্মল ভৃত্যের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বলিল, "যা তাঁকে এইখানে পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল; বাসনাদেবী বলিলেন, "তা হ'লে তুই ততক্ষণ নায়েব মশায়ের সঙ্গে কথা ক', আমি সরকার মশাইকে দিয়ে বরদাবাবুকে লিখে পাঠাই যে তুই পরশু পাত্রী দেখবার জন্যে এখান থেকে রওনা হবি। কি বলিস্?"

নির্ম্মল মস্তক নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, জননী আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন, কিন্তু নায়েব মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া অবগুণ্ঠনটা মস্তকের উপর একটু টানিয়া দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। নায়েব মহাশয় ভূতপূর্ব্ব প্রভুপত্নীকে সম্মুখে দেখিয়া

মাথাটা নীচু করিয়া একটা গড় করিলেন ;—তাহার পর নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ছোটবাবু, রামনগর কাছারিতে কাল একটা বড় দাঙ্গা হ'য়ে গেছে,—সেখানে অন্ততঃপক্ষে দু'দিনের জন্যও আপনার একবার যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন! ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, প্রজায় প্রজায় মারধোর করেছে, আপনি গিয়ে শুধু একবার দাঁড়ালেই সব মিটে যাবে। কালই যদি যান তাহ'লে আজই সব বন্দোবস্ত ঠিক করতে হবে। আপনার হুকুম পেলে আমি যাবার সব বন্দোবস্ত ঠিক কর্ত্তে পারি।"

নায়েব মহাশয় বহুদিনের পুরাতন বৃদ্ধ লোক ; বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া বাসনাদেবী তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। নায়েব মহাশয় নীরব হইবা মাত্র তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা যখন দরকার তখন যেতে হবে বইকি আপনি যাবার বন্দোবস্ত করুন। আপনিও সঙ্গে যান ও ছেলে মানুষ ওতো কিছু জানে শোনে না।"

নায়েব মহাশয় দুইবার হাত কচ্‌লাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আমিতো সঙ্গে যাবোই! ছোটবাবু এখন কিছুই জানেন না শোনেন না। ওকে কি আমি একেলা পাঠাতে পারি।"

নির্ম্মল একটীও কথা কহিল না,—জীবনে কথা কহিবার আর

ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জগতে থাকিতে হইলে কথা না কহিলে উপায় নাই। তাই নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি কথাই কহিতে ছিলেন না একেবারে কথা না কহিলেই যেখানে মন্দ বলে সেই খানেই কেবল কথা কহিতে ছিলেন। তাহার প্রাণে একটুও সুখ ছিল না অশান্তির আগুন চারিদিকে হু হু করিয়া জ্বলিতে ছিল, তাহার প্রাণ তাহার মনের নিকট কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "এই তনিমা কি সেই তনিমা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আজ দুই দিন নির্ম্মল রামনগর কাছারিতে আসিয়াছে, সে আসিয়া পৌঁছিবা মাত্রই রামনগর কাছারির গোলোযোগ মিটিয়া গিয়াছে। রঘুনাথবাবুর মৃত্যুর পর জমিদাপুত্র এক দিনের জন্যও এ মহলে আসে নাই,—কোন প্রজাই জমিদার পুত্রকে দেখে নাই, জমিদার পুত্র আসিয়াছে এই সংবাদ মহলময় রাষ্ট্র হইবা মাত্র সমস্ত প্রজা বাদবিসম্বাদ ভুলিয়া জমিদার পুত্রকে দেখিবার জন্য কাছারি বাড়ীতে ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রজাদিগের ভিতর যেটুকু অশান্তি কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল,—মহলে জমিদার আসিয়াছে শুনিয়া তাহারা সে গোলযোগ নিজেদেরই ভিতর আপষে মিটাইয়া লইয়া সাধ্যমত নজর লইয়া কাছারি বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। সরল-প্রাণ উদার-হৃদয় নির্ম্মলকুমার সকলকেই, মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিদায় করিল। জমিদার পুত্রের জয় ধ্বনিতে সমস্ত মহল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

রামনগর কাছারির নিম্ন দিয়া পল্লীতে পল্লীতে নিৰ্ম্মল সলীল বিচরণ করিয়া আবাহমান কাল হইতে একটী নদী বহিয়া আসিতে ছিল। নদীটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার জল একেবারে কোন দিন শুষ্ক হইয়া যাইত না, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড কিরণেও নৌকা চালাচলের মতন জলের কোন দিনই তাহার অভাব হইত না। বৎসরের সমস্ত ঋতুতেই মহাজনদিগের বড় বড় ভড় মাল বোঝাই করিয়া এই নদীর উপর দিয়া আপন গন্তব্য পথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। অস্থিরচিত্ত নিৰ্ম্মল সমস্ত দিন একাকী কাছারিতে বসিয়া বসিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কৰ্ম্মহীন ভারগ্রস্ত সময় যেন আর কাটিতে চায় না,—সূর্য্য যেন আর ডোবে না। শান্তিশূন্য, সুখ শূন্য প্রাণ যেন একটী মূর্ত্তির অন্বেষণে জগতের সমস্ত ক্ষুধা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সে ক্ষুধার নিস্কৃতি না হইলে তাহার জীবন ধারণ অসম্ভব। সমস্ত দিন বিষম পরিশ্রমে রক্তমুখে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিম কোনে ঢলিয়া পড়িলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ হেলিয়া দুলিয়া গোধূলীর সম্ভাষণে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিতে লাগিল। নিৰ্ম্মলকুমার উঠিয়া বসিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া জামা কাপড় আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রভুর হুকুম পাইয়া জামা কাপড় আনিয়া উপস্থিত করিল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন নদীর ধারে যাইয়া

উপস্থিত হইল তখন সূর্য্যদেব নদীর পরপারে বিস্তৃত প্রান্তরের নিম্নে অর্দ্ধঅঙ্গ ডুবিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রক্তিম মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়া সমস্ত আকাশে যেন একটা আবিরের খেলা চলিতেছিল। আকাশের সাদা মেঘ লাল হইয়াছে,—নদীর কাল জল লাল হইয়াছে,—সমস্ত জগৎ যেন আবির মাখিয়া অপরূপ শোভায় একেবারে রাঙ্গিয়া উঠিয়াছে। নিম্মল নদীর তীরের উপর দিয়া বিভোর হইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে ছিল, নদীর তীরের মুক্ত বাতাস হু হু করিয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে লুটোপুটি খাইয়া,—যেন তাহার অশান্তি প্রাণে কতকটা শান্তি দিবার চেষ্টা করিতেছিল। নির্ম্মল বাহ্য চৈতন্য হারাইয়া দূরে আকাশের দিকে চাহিয়া সূর্য্যাস্তের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল, সহসা দাঁড় ফেলার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার দৃষ্টি নদীর দিকে পতিত হইল। নির্ম্মল দেখিল, একখানা বজরা নদীর তীরের দিকে আসিতেছে, বজরাখানি যে কোন সম্ভ্রান্ত জমিদারের তাহা বজরার সাজ্ সজ্জা আসবাব পত্র দেখিলে বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। বজরার ছাদের উপর বসিয়া দুইটী বালিকা সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল;—অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব মুখের উপর পড়ায়

বালিকা দুইটিকে দূর হইতে বড়ই সুন্দর বোধ হইতেছিল। তাহাদের বেশ ভূষায় বেশ একটু ঐশ্বর্য্যের গরীমা ছিল। বজরার উপর মাঝির পার্শ্বে একজন বরকন্দাজ দাঁড়াইয়া যেন বজরাধিকারী যে ঐশ্বর্য্যবান তাহারই পরিচয় দিতে ছিল। বারখানা দাঁড় এক সঙ্গে পড়ায় বজরাখানা তীরের দিকে ঠিক তীরের মতই আসিতেছিল। বজরাখানা দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্র এ বোট কাহার,—কোন জমিদারের তাহা জানিবার জন্য বেশ একটা কৌতুহল নিম্মলকুমারের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ মহল তাহাদের,—এই গ্রামের নিকটে বা আসেপাশে অপর কোন জমিদারের কাছারি আছে নাকি? বজরাখানা তীরের দিকে আসিতেছে কেন,—নির্ম্মল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বেশ একটা আগ্রহ দৃষ্টি লইয়া বজরার দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে বজরাখানা একেবারে তীরের নিকটবর্ত্তী হইল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে,—গোধূলীর পাণ্ডুরবর্ণ মূর্ত্তি তখন ধরার পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িয়া সন্ধ্যারাণীর ম্লান ছায়া নদীর ভিতর হইতে জাগাইয়া তুলিতেছিল। জল, স্থল, আকাশ, বাতাস সমস্তই যেন একটা ধূসরবর্ণ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া

ম্যালেরিয়া রোগীর মত কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। বজরাখানা তীরের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র,—বজরার আরোহীদিগের মূর্ত্তিগুলি সেই সন্ধ্যার ম্লান ছায়ার ভিতর হইতেও কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নির্ম্মল বজরাখানার দিকেই চাহিয়া ছিল, মূর্ত্তিগুলি একটু স্পষ্ট হইবা মাত্র তাহার প্রাণের ভিতর সহসা যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। সন্ধ্যার ধূসরবর্ণ মূর্ত্তি তাহার চক্ষের সম্মুখে একেবারে গাঢ় কাল হইয়া উঠিল। বজরার ছাদের উপরে যে দুইটি বালিকা বসিয়াছিল,—তাহার মধ্যে একটীর মূর্ত্তি তাহার চক্ষে যেন একটা চমক লাগাইয়া দিল। আশ্চর্য্য! সেই ভিখারী বালিকার মূর্ত্তির সহিত এই বালিকার মূর্ত্তির কোনই পার্থক্য নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে অতি অল্প সময়ের জন্য যদিও নির্ম্মলের সেই বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তথাপি কি নির্ম্মল সে মূর্ত্তি ভুলিতে পারে? সে মূর্ত্তিটুকু যে তাহার হৃদয়ের মাঝখানে একেবারে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি বহুমূল্য পরিচ্ছদে যতই আবৃত হউক,—নির্ম্মলের চক্ষে তাহা লুকাইবার উপায় নাই। মধুর হাসি,—সেই ভাব-ভঙ্গি,—সকলই সেই। নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল

না,—কে যেন সবলে একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে বজরার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। একজন লোককে বজরার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বালিকা দুইটি বজরার ছাদ হইতে নামিয়া, তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে চকিতের ভিতর নির্ম্মল যেটুকু দেখিল তাহাতেই সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। আজ দুই বৎসর যে মূর্ত্তিখানির অনু-সন্ধানে সে দেশে দেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে,—সেই মূর্ত্তিখানি তাহার এত নিকটে,—তাহারই জমিদারীর ভিতর আজ একি ভুবনমোহিনী বেশে তাহার চক্ষের সম্মুখে একটা মায়া বিস্তার করিয়া ধরিল। এই বালিকা কি সেই বালিকা? সে যে মলিন বসনা ভিখারিনী নন্দিনী,—আর এ যে হীরকালঙ্কার ভূষিতা রাজনন্দিনী। স্বর্গে, মর্ত্তে যতখানি পার্থক্য—এই বালিকার সহিত সেই বালিকার বেশ-ভুষার তাহারও অধিক পার্থক্য। আজি কত দিন হইল নির্ম্মল সেই বালিকাকে দেখিয়াছে,—কিন্তু তথাপি সেই মূর্ত্তিখানি আজও যে তাহার প্রাণের ভিতর সুস্পষ্টরূপে জাগিতেছে,—যেন কাল তাহাকে দেখিয়াছে। এই বালিকাকে দেখিয়া সেই মূর্ত্তিখানি কেন এমন করিয়া তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল,—এই বালিকা কি সেই বালিকা!

তাহাও কি কখন সম্ভব! কোথায় সেই অন্নহীনা মলিন বসনা ভিখারিনী—আর কোথায় এই বহুমূল্য পরিচ্ছদধারিনী হিরকালঙ্কার ভূষিতা রাজরাণী। বালিকাকে দেখিবা মাত্র কৌতূহল নির্ম্মলকুমারের প্রাণের ভিতর কেবলই তাল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। বালিকা কে,—কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একরাশ প্রশ্ন একসঙ্গে আসিয়া তাহার কণ্ঠনালীতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু একটাও প্রশ্ন কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারিতে ছিল না। বজরা তীরের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র মাঝি নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু এ কোন্ গাঁ ?"

নির্ম্মলের দৃষ্টি মাঝির উপর পতিত হইল, সহসা মাঝির প্রশ্নে নির্ম্মল থতমত খাইয়া গিয়াছিল, সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া মাঝির দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "রামনগর"।

মাঝি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার জমিদারী বল্‌তে পারেন ?"

কাহার জমিদারী এইটুকু বলিতে যেন নির্ম্মলকুমারের কেমন একটা সঙ্কোচ আসিল,—নিজের নামটা বলিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিল। সে মাঝির কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "এটা রঘুনাথবাবুর জমিদারী।"

রঘুনাথবাবুর জমিদারী শুনিয়া মাঝি যেন কি একটু ভাবিল,

তাহার পর ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "নওগাঁয়ের রঘুনাথবাবু? তিনি তো মারা গেছেন,—এখন তাঁর ছেলেই বুঝি তাঁর জমিদারী দেখ্‌ছেন?"

নির্ম্মলকুমার মাঝির কথার কোন উত্তর দিল না,—মাথাটা নাড়িয়া কেবল তাহার কথার অনুমোদন করিল। বজরার ভিতর হইতে মধুর কণ্ঠস্বর বাহির হইল, "মাঝি বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করতো,—বগলেশ্বরী এখান থেকে কতদূর।"

কণ্ঠস্বর মধুর হইলেও এ কণ্ঠস্বর তো সে কণ্ঠস্বর নহে,—বালিকার কণ্ঠস্বর তো নির্ম্মল আজও ভুলিতে পারে নাই,—সে কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণকুহরে বীণার-ঝঙ্কারের মত আজিও ধ্বনিত হইতেছে। মাঝি বজরার ভিতর হইতে আদেশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু এখান থেকে বগলেশ্বীর মন্দির কতটা পথ হবে?"

নির্ম্মল কেবল মাঝির প্রশ্নেরই উত্তর দিতে ছিল,—তাহার নিজের শত প্রশ্ন পেটের ভিতর তাল পাকাইতেছে অথচ সে একটীও কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসরটুকু পাইতেছিল না। তাহার প্রাণের ভিতর শত কৌতূহল বাহিরে বাহির হইবার জন্য কণ্ঠনালীতে একেবারে মারামারি বাধাইয়া তুলিয়াছিল,—তথাপি সে সেটাকে

কোন ক্রমে দমন করিয়া আবার মাঝির প্রশ্নের উত্তর দিল, "বগলেশ্বরীর মন্দির এখান থেকে কতদূব তা আমি জানিনি।"

নির্ম্মল এতক্ষণ মাঝির দিকে চাহিয়াই তাহার কথার উত্তর দিতে ছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি বজরার উপর পতিত হওয়ায় সে দেখিল বালিকাদ্বয়েব ছায়া আসিয়া বোটের দবজার উপর পড়িয়াছে। নির্ম্মল বালিকাদ্বয়কে একটু ভালো করিয়া দেখিবাব জন্য সেই দিকে চাহিল,—কিন্তু তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নদীর জল কাল করিয়া একেবারে ঘনিভূত হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার আর সে সাধ পূর্ণ হইল না,—সন্ধ্যার অন্ধকারে সে ভাল কিছুই দেখিতে পাইল না। সে মাঝিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "এ বজরা কার? কোথায় যাচ্ছে?"

মাঝি উত্তব দিল, "এ বজরা দিগম্বরবাবুর,—যাচ্ছে সদরে।"

মাঝির কথায় নির্ম্মলের কৌতূহলেব কিছুই নিবৃত্তি হইল না। সে যেটুকু জানিতে চাহিতেছিল—ইহাতে তাহার কিছুই জানা হইল না। যেটুকু জানা তাহার প্রয়োজন—সেটুকু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বালিকাদ্বয়ের নাম জানিতে পারিলে হয়তো তাহার কৌতূহলের কতকটা নিবৃত্তি হইতে পারে—কিন্তু বালিকাদ্বয়ের নাম সে কোন্ হিসাবে জিজ্ঞাসা করিবে! অপরিচিত ভদ্রলোক কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করা একেবারেই ভদ্রতার বিরুদ্ধ। সে যেটুকু জিজ্ঞাসা করিতে পারে সেটুকু জিজ্ঞাসা করিয়াছে। মাঝিকে আর কোন প্রশ্ন করাই চলে না। নির্ম্মল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একটা বিশেষ দৃষ্টিতে মাঝির মুখের দিকে চাহিল। সেই সময় বালিকাদ্বয়ের ভিতর হইতে একজন অতি মৃদুস্বরে অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাঝিকে জিজ্ঞাসা করনা ভাই,—যে বাবুটি কথা কইছেন, ওর নাম কি?"

অপর বালিকা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "তা জেনে কি লাভ তোর?"

অপর বালিকা অতি মৃদুকণ্ঠে আবার কি উত্তর দিল, নির্ম্মল তাহা শুনিতে পাইল না কিন্তু আগে যেটুকু শুনিয়াছিল তাহাতেই তাহার প্রাণের সমস্ত তার একেবারে তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। এ যে সেই স্বর!—সে আকুল আগ্রহে বালিকাদ্বয়ের কথাগুলি শুনিবার জন্য কাণটা খাড়া রাখিয়াছিল, সহসা মাঝির বিকটস্বরে সে চমকিত হইয়া মাঝির দিকে ফিরিল। মাঝি খনখনে গলায়

বলিল, "রামনগরের জাগ্রত দেবী বগলেশ্বরীর মন্দিরের নাম শোনেননি, আপনার বাড়ী বুঝি এখানে নয় ?"

নির্ম্মল এ অঞ্চলে জীবনে এই প্রথমে আসিয়াছে, বগলেশ্বরীর মন্দির কোথায় কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না,—এমন কি সে তাহার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। সে বিস্মিতভাবে মাঝির দিকে চাহিয়া মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "না আমি এখানে থাকি না, দুইদিন হ'লো সবে এখানে এসেছি।"

মাঝি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বজরার মুখ ঘুরাইয়া দিল ; দাঁড়িগণ দাঁড় ফেলিল, বজরা দুলিয়া টলিয়া অগ্রসর হইল। বজরা ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বালিকার স্বর নির্ম্মলের কর্ণে প্রবেশ করিল, "আয় ভাই তনিমা ছাদে গিয়ে বসি।"

তনিমা! নির্ম্মলের বুকের সমস্ত রক্ত একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বজরা ফেরাও বলিয়া সে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিল কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বজরার দিকে চাহিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত প্রাণটা ছুটিয়া যাইয়া বজরার উপর লাফাইয়া উঠিবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বজরা

দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলের প্রাণের অন্ধকার যেন একবার বিদ্যুতের আলোয় সচকিত হইয়া আবার বিরাট অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নির্ম্মল কতক্ষণ সেই ভাবে নদীর ধারে দাড়াইয়াছিল, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিয়াছে। কৃষ্ণ-পক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আকাশের কোন হইতে উঁকি মারিয়া অন্ধকার জগতকে নির্ম্মল আলোয় হাসাইয়া তুলিয়াছে। চাঁদের হাসি নদীর জলে ঢেউয়ের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া যেন চারিদিকে সোনা ছড়াইয়া দিতেছে। নির্ম্মলের সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই, সে একেবারে চৈতন্য হারাইয়া নদীর যে মুখে বজরা গিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া আছে। কাছে আসিয়া প্রাণের জিনিষ চলিয়া গেল,—ধরি ধরি করিয়াও ধরা হইল না। সন্দেহ ভঞ্জনের পূর্ব্বেই একবার মাত্র সন্দেহের দোলায় দোলাইয়া দিয়া উড়ো পাখী উড়িয়া গেল, শূন্য পিঞ্জর পূর্ব্বেও যেমন শূন্য ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপই শূন্য পড়িয়া রহিল। কেবল একটা দারুণ নিরাশা ধোঁয়ার মত নদীর ভিতর হইতে উঠিয়া তাহাকে একেবারে ঘেরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্ম্মল চলনশক্তি,—এমন কি

নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সহসা মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। পশ্চাতে দুইজন পাইক প্রকাণ্ড দুইটা বাঁশের লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান। তাহারা নির্ম্মলকে ফিরিতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি একটা গড় করিয়া বলিল, "হুজুরের সন্ধানে আমরা চারিদিক খুঁজে, শেষ এখানে এসে আপনাকে ধরেছি। হুজুর রাত ঢের হ'য়েছে,—আপনাকে এত রাত পর্য্যন্ত ফিরতে না দেখে নায়েব মশাই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চলুন শিগ্‌গির কাছারি বাড়িতে ফিরে?"

পাইকদিগের কথায় নির্ম্মলের চমক ভাঙ্গিয়াছিল,—সে রাত্রের পরিমাণটা অনুমান করিবার জন্য একবার আকাশের দিকে চাহিল। তৃতীয়ার চাঁদ তখন আকাশের অনেকখানি উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে,—আসে পাশে ঝোপের ভিতর,—নদীর উপর যেটুকু অন্ধকার ছিল, তাহাও একেবারে সরিয়া গিয়াছে। রাত্রি দিনমানের ভাব ধারণ করিয়াছে,—রাস্তা ঘাট চাঁদের আলোয় একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। জগৎ যেন আজ চাঁদের হাসিতে হাসি মিশাইয়া একেবারে আনন্দভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া বসিয়াছে। জগতের এই আনন্দভাব নির্ম্মলের সহ্য হইল না,—

তাহার মনে হইল তাহার অবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন হাহা করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে হাসির লহর তুলিয়াছে। কথাটা শেষ করিয়া পাইকদ্বয় মাথাটা নীচু করিয়া বাবুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল, নির্ম্মল বড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবলমাত্র বলিল, "চল।"

পাইকদ্বয় অগ্রসর হইল,—নির্ম্মল তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কাছারি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। নায়েব মহাশয় কাছারি বাটীর বারান্দার উপর নির্ম্মলের অপেক্ষায় চিন্তিতমনে পায়-চারি করিতেছিলেন, নির্ম্মলকে পাইকদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তিনি যেন বেশ একটু সুস্থ হইয়া মনিবকে আগাইয়া লইবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। নায়েব মহাশয়কে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইল না,—নির্ম্মল কাছারি বাটীর কম্পাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নায়েব মহাশয় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবাবুর আজ এত রাত হ'লো কেন? বেড়াতে বেড়াতে বেশ একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলেন বুঝি?"

নায়েব মহাশয়টি বৃদ্ধলোক,—তিনি রঘুনাথবাবুর আমল

হইতেই কার্য্য করিতেছিলেন। রায়েদের নিকটেই প্রায় বিশবৎসর তাহার অতিবাহিত হইয়াছে। নির্ম্মলকে তিনি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাপের আমলের বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া নির্ম্মলও তাঁহাকে বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করিতেন। জমিদারী সম্বন্ধে ভালমন্দ যাহা কিছু কাজ সমস্তই নায়েব মহাশয় সম্পন্ন করিতেন,—তাঁহার কার্য্যে নির্ম্মল কোন দিনই বিঘ্ন দেন নাই। তিনি জমিদারীর কিছুই দেখিতেন না, নাম মাত্র কেবল স্বাক্ষর করিতেন। নায়েব মহাশয়ের কথার উত্তরে নির্ম্মল মৃদুস্বরে বলিল, "না, আমি এই নদীর ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। রাত যে এত বেশী হ'য়েছে তা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি।"

নির্ম্মল কথাটা শেষ করিয়াই, যে ঘরখানিতে সে দুইদিন বাস করিতেছে বারান্দা অতিক্রম করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। কাছারি বাটীর অন্যান্য ঘরের অপেক্ষা এই ঘরখানিই অধিক সজ্জিত। ঘরের ভিতর একখানি ছোট খাট, তাহাতে সুকোমল বিছানা পাতা,—তাহার উপর রাজহংসের পালকের ন্যায় চাদর খানা একেবারে ধবধব করিতেছে। গৃহের এক পার্শ্বে একটা দর্পন সংযুক্ত ডেসিং টেবিল। টেবিলের উপর ব্রোস, চিরুনী

তোয়ালে প্রভৃতি সজ্জিত। এক পার্শে একটী ক্ষুদ্র গ্লাসকেশ। তাহার পাঁচটি থাকই নানাবিধ পুস্তকে পরিপূর্ণ। স্বয়ং জমিদার কিংবা তাহার পুত্র মহল দেখিতে আসিলে তাহার আস্তানা এই ঘরখানিতেই হইয়া থাকে। নায়েব মহাশয়ও নির্ম্মলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মল জামাটা খুলিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া একেবারে যাইয়া শয্যার উপর আড় হইয়া পড়িল। নায়েব মহাশয় বেশ একটু চিন্তিতস্বরে বলিলেন, "শরীরটা কি বেশ একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাহ'লে এক কাজ করুণ, রাত্রের আহারটা সকাল সকাল শেষ করে বেশ করে একটু নিদ্রা দিন। কি বলেন খাবার আনতে কি এখন বলবো। আপনার খাবার তৈয়ারী হ'য়েছে।"

নির্ম্মল মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "না, খাবার একটু রাত করে খেলেই হবে। এখন আমার তেমন ক্ষিদে হয়নি।"

"তা হ'লে যখন খাবেন আমায় ডাকবেন, আমি ততক্ষণ এ মহলের এ বৎসর আদায়ের হিসেব নিকেসটা দেখিগে।" নায়েব মহাশয় এই কয়টা কথা বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন ;—নির্ম্মল সহসা একেবারে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের আশে পাশে আর কোন জমিদারের বাড়ী আছে নাকি?"

নির্ম্মলের প্রশ্নটার অর্থ যে কি নায়েব মহাশয় ভাল বুঝিতে পারিলেন না। মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "না, খুব কাছে কোন জমিদারের বাড়ী নেই। তবে এখান থেকে প্রায় কোশ দুই হবে, বাসন্তীপুরে একঘর জমিদার আছেন, তাদের জমিদারীর মুনফাও যথেষ্ট। এ কথাটা হঠাৎ জিজ্ঞেসা করছেন কেন? ব্যাপারটাতো তেমন পরিস্কার হলো না?"

নির্ম্মল কথাটা পরিস্কার করিয়া দিল, সে নায়েব মহাশয়ের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি নদীর ধারে আজ একখানা বজরা দেখ্‌লুম,—সেখানা কোন জমিদারের বজরা বলেই আমার বোধ হয়। মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লুম সেখানা দিগম্বর-বাবুর বজরা।"

নায়েব মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তা হ'লেই ঠিকই হয়েছে। বজরা বাসন্তীপুরেরই বটে। দিগম্বরবাবু আজ প্রায় পাঁচ সাত বৎসর হ'লো মারা গেছেন। তার ছেলে নেই কেবল একটী মেয়ে। সেই মেয়েই এখন এই জমিদারির মালিক। দিগম্বরবাবুর জ্ঞাতিদের সঙ্গে আর তার মেয়ের আজ ক'বছর

থেকে মালিকিনী সত্ত্ব নিয়ে একটা মস্ত মামলা হচ্ছিল,—শেষ বিলেত পর্য্যন্ত আপিল হয়ে সম্প্রতি তার কন্যাই সম্পত্তির মালিক সাব্যস্ত হয়েছে। সেই জন্য জমিদারীটা এই কয় বৎসর ধরে বড়ই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, এখন আবার ধীরে ধীরে সব ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ছে। দিগম্বরবাবুর মৃত্যুর পর তাহার জ্ঞাতিরা বিলক্ষণ একটু হোমরাই চোমরাই লাগিয়েছিল, এখন একেবারে খোতা মুখ ভোতা হয়ে গেছে।”

নির্ম্মল বেশ একটু উদ্‌গ্রীবভাবে নায়েব মহাশয়ের কথাগুলি শুনিতেছিল, নায়েব মহাশয় নীরব হইবা মাত্র বেশ একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, তারা কিছু গোলমাল করেছিলো নাকি?”

নায়েব মহাশয় দাঁড়াইয়াছিলেন, ধীরে ধীরে আসিয়া নির্ম্মলের পার্শ্বে বসিলেন, গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “বিলক্ষণ! দিগম্বরবাবুর মেয়েকে মোটে আমলেই আনেনি? তার মৃত্যুর পরই তারা সম্পত্তির দখল নেয়, এমন কি তার মেয়েকে আর স্ত্রীকে বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দেয়। আমাদের সদরের উকিল বরদাবাবুর বিশেষ চেষ্টায় তারা আবার তাদের সম্পত্তি ফিরে পেয়েছে। শুনেছি দিগম্বরবাবুর স্ত্রী এই সকল হাঙ্গামার পড়ে নানা দুঃখ যন্ত্রনা পেয়ে মারা গেছেন।”

নির্ম্মলকুমার কোন কথা কহিলেন না। নায়েব মহাশয় একটু নীরব থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন, "বজরার ভেতর কারুকে কি দেখতে পেলেন।"

নায়েব মহাশয়ের প্রশ্নে নির্ম্মলের প্রাণের ভিতর আবার একটা তরঙ্গ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। সে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "হাঁ আমি বজরার ছাদে দু'টী মেয়েকে দেখলুম। যদিও তখন সন্ধের অন্ধকারে সমস্তই অস্পষ্ট হয়ে এসে ছিল, তবু আবছায়ায় যা দেখেছি তাতেই আমার মনে হয় মেয়ে দুটি পরমা সুন্দরী, যথার্থ জমিদারেরই মেয়ের মতন।"

নায়েব মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, আপনি যাদের দেখেছেন তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন দিগম্বরবাবুর মেয়ে। আমি দেখিনি তবে শুনেছি তনিমা দেবী নাকি পরমাসুন্দরী।"

তনিমা দেবী! হাঁ তনিমা দেবীই বটে। বজরার মুখ ঘুরিবা মাত্র, আয় ভাই তনিমা ছাদে যাই,—বালিকার মধুর স্বর তখনও নির্ম্মলের কাণে বাজিতেছিল। গৃহের ভিতর একখানা টিপায়ের উপর একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের ল্যাম্প দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল,—সে আলো নির্ম্মলের চক্ষে একেবারে ঝাপসা

হইয়া গেল। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে নায়েব মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না।

নায়েব মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "দিগম্বরবাবু লোকটি ছিলেন বড় ভাল। তাঁর শত্রু ছিল না বল্লেই হয়। আমাদের বাবুর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তিনি নওগাঁয়েও অনেকবার গেছেন। আপনি তো দেশে বড় আগে খুব কমই থাক্তেন সেই জন্যে আপনি তাকে দেখেননি!"

নায়েব মহাশয় নীরব হইলেন, নির্ম্মল ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "দিগম্বরবাবুর মেয়ের কি এখনও বিয়ে হয়নি?"

নায়েব মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "বিয়ে হয়েছে বলে তো বোধ হয় না। নিশ্চয়ই বিয়ে হয়নি,—বিয়ে হলে খবর পাওয়া যেত।"

নির্ম্মল বিস্ফারিত চক্ষে নায়েব মহাশয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও বিয়ে না হবার কারণ কি? মেয়েটির বিয়ের বয়স তো হয়ে গেছে বলে বোধ হয়!"

নায়েব মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা ঠিক বলতে পারিনি তবে আমার বোধ হয়,—মামলা মকর্দ্দমার জন্যে এত দিন বিয়ে

হতে পারিনি এইবার বোধ হয় হবে ;—তা ছাড়া মেয়েটিরতো আপনার কেউ নেই। বরদাবাবুই এখন তার অবিভাবক।”

নায়েব মহাশয় স্বকার্য্যে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নির্ম্মল ধীরে ধীরে বলিল, “কাল সকালেই আমি নওগাঁয়ে ফিরে যাব,—আজ রাত্রেই তার বন্দোবস্ত করবেন। বিশেষ প্রয়োজন, কালই আমার সকালে যাওয়া চাই।”

“আজ্ঞে তাই হবে”, বলিয়া নায়েব মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নির্ম্মল একটা বালিস টানিয়া লইয়া শয্যার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আড় হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর তখন চিন্তা-স্রোত সাদা কাল দুইটা রেখা টানিয়া হু হু শব্দে প্রবাহিত হইতে ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলের গন্ধ মধুর হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে,—সম্মুখে ক্ষুদ্র ফুলের বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া বায়ুভরে দুলিতেছে। মলয় সমীর কুসুম সুরভী অঙ্গে মাখিয়া মানুষের কাণে কাণে কত আনন্দের স্মৃতি ঢালিয়া দিয়া,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া চারিদিকে যেন তৃপ্তি প্রীতি ছড়াইয়া দিতেছে। বরদাবাবু বহুক্ষণ হইল কাছারি হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া,—পরিশ্রান্ত দেহটাকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য বাটীর সম্মুখস্থ বারান্দায় একখানা আরাম কেদারার উপর পড়িয়া পরদিনের মুলতুবী মামলাগুলার চিন্তা করিতেছিলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ মাথায় লাগিয়া একটা মহা আরামে তাহার চক্ষু দুইটী মুদিয়া আসিতেছিল।

ওকালতী করিয়া বরদাবাবুর মাথার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। সাদা চুল, সাদা গোঁপ তাহাকে গাম্ভীর্য্যের হিমালয় শিখরে তুলিয়া যেন ঋষির মত করিয়া তুলিয়াছে। উপরের সঙ্গে

সঙ্গে ভিতরটাও তাঁহার ঋষিরই মত ছিল। মক্কেলের মামলা তিনি নিজের মাম্‌লার মত করিয়া তদ্‌বীর করিতেন। তিনি যে মাম্‌লাটা গ্রহণ করিতেন প্রায় তাহা হার হইত না, সেই জন্য তাঁহার পসার যথেষ্ট ছিল। রাশি রাশি মক্কেল সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত। সরস্বতীর আনুকুল্যে লক্ষীদেবীর কৃপায় তাঁহার অর্থের কোনই অভাব ছিল না। বরদাবাবু বহুক্ষণ সেই আরাম কেদারাখানায় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা মনুষ্যের পদশব্দে তিনি চক্ষু মেলিলেন। ভৃত্য গুড়গুড়ির দগ্ধ কলিকাটা বদলাইয়া দিতে আসিয়াছিল,—তাহারই পদ শব্দে তিনি চক্ষু মেলিয়াছিলেন। সম্মুখে ভৃত্যকে দেখিয়া বলিলেন, "তোর দিদিমনিকে একবার ডেকে দে দেখি!"

ভৃত্য গুড়গুড়ির উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া তাহাতে ফুঁ দিতেছিল, সে বাবুর হস্তে গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বরদাবাবু গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া সবে মাত্র তাহাতে গোটা দুই টান দিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার কন্যা অনুপপা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুপপার বয়স বার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—গড়নটি ছিপছিপে, দেখিতে মোটের উপর মন্দ নয়,—মুখখানি বেশ একটু কমনীয়তায় মণ্ডিত। সে পিতার সম্মুখে

আসিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আপনি কি আমায় ডাক্‌ছিলেন!"

বরদাবাবু গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "হাঁ মা,—দিগম্বরবাবুর মেয়ে আমাদের বাড়ী এসেছে,—তার আদর যত্নের তো কোন ক্রটী হচ্ছে না? তারা বড় লোক,—আমাদের মত গৃহস্থের বাড়ীতে তাদের নানা অসুবিধে হবার সম্ভাবনা;—দেখ মা যতদূর সম্ভব তার যত্ন আদরের ক্রটী যেন না হয়। দিগম্বরবাবু আমাকে তাঁর ছোট ভায়ের মত দেখতেন। প্রথম যখন এসে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি তখন দিগম্বরবাবু আমাকে সাহায্য না কল্লে আমার এ অবস্থা হবাব কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে আমার বাড়ীতে রাখ্‌বার অনেক চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু কিছুতেই তিনি সম্মত হননি,—নানা যন্ত্রনা পেয়ে শেষ তিনি মারা গেলেন। অনেক মামলার পর শেষ যদিও দিগম্বরবাবুর সম্পত্তি তার মেয়েকে ফেরত দিতে পারলুম কিন্তু তার স্ত্রীর যে প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে পারলুম না সেইটাই আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ।"

বরদাবাবু আবার গুড়গুড়ির নলটায় গোটা দুই টান দিলেন, একরাশ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে

লাগিল,—তিনি উড্ডীয়মান ধোঁয়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "এই সব নানা গোলযোগে দিগম্বরবাবুর মেয়েব বিয়ে দিতে এত বিলম্ব হয়ে পড়েছে,—তাছাড়া আজ কাল ভালো পাত্র পাওয়াও দুর্ঘট,—যা হ'ক্ আব তার বিবাহে বিলম্ব কবা উচিত নয়। আমাব মক্কেলের একটী সর্ব্বগুণবান পুত্র আছে আমি তারই সঙ্গে তনিমার বিবাহ স্থির করেছি,—দুই এক দিনের মধ্যেই পাত্র নিজে পাত্রী দেখ্‌তে আসবে। সেই জন্যই তনিমাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে তোমাকে বাসন্তী পুরে পাঠিয়ে ছিলেম। কিন্তু এখন ভেবে দেখ্‌লেম আমাব বাড়ীতে পাত্রী দেখান উচিত নয়। পাত্রী সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, তার নিজের বাড়ীতেই দেখা শোনা হওয়া উচিত। পাত্র এখানে এসে পৌঁছুলে আমি তাকে নিয়ে বাসন্তীপুরে উপস্থিত হব। সেই কথাটাই তোমার সইকে বলে দাও!"

অনুপমা এতক্ষণ একটীও কথা না বলিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিতার কথাগুলি শুনিতেছিল। বরদাবাবু নিজের মনে কত কথাই বলিয়া যাইতেছিলেন,—কন্যার কর্ণে কতক কথা প্রবেশ করিতেছিল,—কতক প্রবেশ করিতেছিল না। পিতা নীরব হইবা মাত্র, সে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "বাবা, সই

আমার বিয়ে কর্ত্তে চায় না। সে আমায় বলেছে, সে বিয়ে কর্ব্বে না।"

"বিয়ে কর্ব্বে না?" বরদাবাবু আবার কেদারাখানার উপর আড় হইয়া পড়িয়া কন্যার সহিত কথা কহিতেছিলেন কন্যার কথায় মহা বিচলিত হইয়া একেবারে কেদারার উপর উঠিয়া বসিলেন; মহা বিস্মৃত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ে কর্ব্বে না সে কি কথা মা। স্ত্রীলোকের বিয়ে না কল্লে হয়! মেয়েমানুষের বিয়ে না হ'লে যে তার জীবনই স্বার্থক হয় না। তা ছাড়া তনিমার কি বিয়ে না কল্লে চলে,—তার অত বড় সম্পত্তি বিয়ে না কল্লে কে তা রক্ষা করবে। মেয়েমানুষের বিয়ে না কল্লে কি হয় মা,—তার বিয়ে করা চাই। সুখ বল, ঐশ্বর্য্য বল, পৃথিবীতে যা কিছু সবই যে স্ত্রীলোকের এক স্বামী। বিয়ে কর্ব্বে না এ কুবুদ্ধি তার মাথায় কোথা থেকে এলো, তাও কি কখন হয়! যাও মা তুমি একবার আমার কাছে তাকে ডেকে নিয়ে এস দেখি। আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লেই সে সব বুঝতে পারবে। বিবাহ যে স্ত্রীলোকের কত বড় ধর্ম্মের পথ প্রসস্ত করে দেয় তা বোঝাবার আমার সাধ্য নেই। যে মেয়েমানুষের বিয়ে হয়েছে সেই তা প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারে।"

সই বিবাহ করিবে না এক দিন কথায় কথায় অনুপমা তাহা

তাহার মুখ হইতে জানিতে পারিয়াছিল। সে কথা যেন তাহার মোটেই ভাল ঠেকে নাই। সে পিতার আদেশ পাইয়া তাহার সইকে ডাকিয়া আনিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বরদাবাবু আবার কেদারাখানার উপর আড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"মেয়েদের লেখা পড়া শেখানটা একেবারেই উচিত নয়। একটু লেখা পড়া শিখলেই তারা নিজের বুদ্ধি খাটাইতে চায়,—কিন্তু বুদ্ধিটা যে কোথায় খাটাচ্চে সেটা ভাল কি মন্দ তা একেবারেই বুঝবার চেষ্টা করে না। দিগম্বরবাবু মেম্ রেখে মেয়েকে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন আজ তাই তার মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। কিন্তু বিয়ে না কল্লে যে কি হতে পারে সেইটুকুতো তার বোঝবার ক্ষমতা নেই।"

বরদাবাবু ডাকিতেছেন শুনিয়া তনিমা তাহার সইয়ের সহিত বরদাবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনের পদ শব্দে বরদাবাবু কেদারাখানার উপর আবার উঠিয়া বসিলেন, তিনি তাহার ভূত পূর্ব্ব বন্ধু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা আমরা গৃহস্থ লোক, আমাদের বাড়ীতে তোমার থাকতেতো কোন অসুবিধে হচ্ছে না। দিগম্বরবাবু আমাকে ছোট ভায়ের মত দেখতেন। মা আমি তোমার কাকার মতন,—এ তোমার

নিজের বাড়ী যদি তোমার কোন অস্থুবিধে হয়, আমাকে বলো লজ্জা করো না।”

তনিমার সর্ব্বাঙ্গে কৈশোর একেবারে ছাপাইয়া উঠিয়া আকুল তরঙ্গে যৌবনের আভাস দিতেছিল। যৌবন আশে পাশে হইতে উকি মারিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে চাদেব কিরণ ঢালিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার সোণার মত রং,—ঢলঢলে মুখখানি কিশোর ও যৌবনের মাঝখানে পড়িয়া এক স্বর্গের দিপ্তী চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিল। বরদাবাবুর কথাব উত্তবে তনিমা অতি মৃদুস্বরে বলিল, “কাকাবাবু আপনার বাড়ীতে আমার অস্থুবিধে! আমিতো পথের ভিখিরী হয়েছিলুম আপনার অনুগ্রহে, আপনার চেষ্টায় আবার আমি আমার পিতৃ বিষয় ফিরে পেয়েছি। আপনি আমার পিতার সমান; বাপের বাড়ীতে এলে কি মেয়েব কোন দিন অস্থুবিধে হয়।”

তনিমার কথায় বন্ধুত্বের পুবাতন স্মৃতি যেন নাড়াচাড়া খাইয়া জাগিয়া উঠিল। বন্ধু নাই, তিনি তো পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার স্নেহের ধারা তিনি যে ছিলেন সেইটুকু জানাইয়া দিয়া জগতের বক্ষে এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বরদাবাবু তনিমার ভিতব বন্ধুব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার প্রাণটা যেন কেমন

অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি নীরবে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। অনুপমা তাহার সইয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, পিতার সম্মুখে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবা সই বিয়ে করবে না,—সে বাবা চিরকুমারী থাক্‌বে ?"

বরদাবাবু মৃদু হাসিলেন, গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "তাকি হয় মা। বিবাহই যে নারী ধর্ম্মের প্রধান সোপান। স্বামীই যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুরু। গুরুর দীক্ষা ব্যতীত তো মা ভগবান পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভগবানেরও তো মা তা ইচ্ছা নয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি, বিবাহ করে সংসার পেতে না বসলে তার আদেশ পালন করা হয় কই মা? কোন স্ত্রীলোকেরই বলা উচিত নয়, বিবাহ করবো না। স্ত্রীলোকের বিবাহ না করাটা আমাদের শাস্ত্রে একটা মহা পাপের মধ্যে গণ্য !

বরদাবাবু একটু নীরব থাকিয়া তনিমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা অনুর কথা কি সত্য, সত্যই কি মা তুমি বলেছ যে তুমি বিয়ে কর্ব্বে না ?"

বরদাবাবুর কথায় রাজ্যের লজ্জা চারিপাশ হইতে আসিয়া তনিমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়াছিল,—সে কথা বলিবার

চেষ্টা করিল কিন্তু লজ্জায় কণ্ঠনালী আবদ্ধ থাকায় কোন কথাই কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। সে অবনত মস্তকে কাপড়ের পাড় খুঁটিতে লাগিল। বরদাবাবু আবাব কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপকরে রইলে যে মা,—তাহ'লে কি কথাটা সত্যি। লজ্জা কি,—আমার কাছে মা তোমার কোন লজ্জা নেই।"
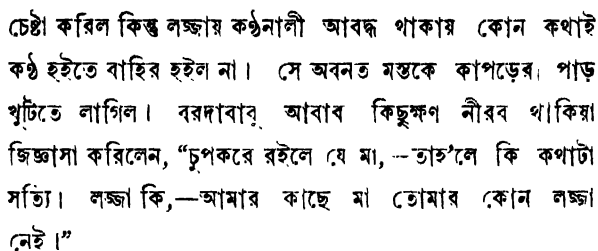
তনিমা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "বিয়ে না কল্লে কি কাকাবাবু কোন ক্ষতি আছে!"

বরদাবাবু একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ক্ষতি নেই, যথেষ্ট ক্ষতি আছে। নিজের হিসেবে দেখতে গেলেও যেমন ক্ষতি,—সমাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও তেমনি ক্ষতি। তুমি স্ত্রীলোক তোমার একজন অবিভাবক প্রয়োজন যে আজীবন তোমায় দেখতে শুনতে পারবে,—সে লোক এমন হওয়া চাই, যার স্বার্থ তোমার স্বার্থের সঙ্গে সমান হবে,—স্বামী ভিন্ন জগতে স্ত্রীলোকের এমন লোক আর কেউ হতে পারে না। কাজেই স্ত্রীলোকের বিবাহ করা বিশেষ প্রয়োজন। সমাজের হিসাবেও তাই বিশৃঙ্খল সমাজকে শৃঙ্খলা বদ্ধ করবার জন্যই বিবাহ। মানুষ যদি বিবাহ না করে তাহ'লে সমাজের কোন শৃঙ্খলই থাকে না।"

তনিমা কোন উত্তর দিল না,—মহা আগ্রহ ভরে বরদাবাবুর কথাগুলি শুনিতেছিল। বরদাবাবু নীরব হইয়া একটা উত্তরের প্রত্যাশায় তাহার মুখের দিকে চাহিল। লজ্জায় তাহার মুখখানি আপনি যেন মাটীর দিকে নত হইয়া পড়িল। বরদাবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "মা আমায় তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বলেই যেন,—তোমার যাতে অমঙ্গল হবে আমি এমন কাজ কোন দিনই কর্ব্বো না। আমি অনেক দেখে শুনে অনেক বিবেচনা করে একটী পাত্র ঠিক করেছি,—শুভক্ষণে শুভদিনে তার হস্তে তোমায় সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হব। আমি যার হাতে তোমায় দেব আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে ;—সে নিশ্চয়ই তোমাকে সুখী কর্ত্তে পারবে। আমরা হিন্দু আমাদের কন্যার বিবাহ ন'দশ বৎসর বয়সেই দেওয়া উচিত,—সে হিসেবে তোমার বিবাহ বয়স অনেক দিনই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"

অনুপমা পিতাকে বাধা দিল, সে শৈশব হইতেই বড় মুখরা ছিল,—সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না বাবা তুমি সইয়ের কোন কথা শুন না,—এই মাসের ভেতরই সইয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। সইয়ের যেমন কথা, কোথায় কে ওর মাকে ডাক্তার দেখিয়েছিল,—তাকেই উনি বিয়ে কর্ব্বেন। সে কি কখন হয়,—সে কে,—কি বৃত্তান্ত জানা

নেই,—তার বাড়ী কোথায় তারও ঠিক নেই। তাহলে কি আর বিয়ে না করে চলে।”

কন্যার কথায় বরদাবাবু একটু যেন বিস্মিতভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি রকম ?”

অনুপমা, তাহার সইয়ের গা ঠেলিয়া বলিল, “বল না ভাই বাবাকে সব,—বল্‌বার কি আছে তোর ?”

বরদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, “বল মা,—আমিতো পূর্ব্বেই বলেছি আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই। সব কথা খুলে বল, আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয়,—তোমার সুখের জন্য আমি তা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করবার চেষ্টা করবো।”

তনিমা একটু নীরব থাকিয়া লজ্জিত কম্পিত স্বরে রাশের রাত্রের বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া বলিল, “তিনি বড় দয়ালু, তাঁর একবার—”

বরদাবাবু তনিমাকে আর কথা কহিতে দিলেন না,—তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “তার অনুসন্ধান কর্ত্তে বলো মা,—তার অনুসন্ধান কর্ত্তে আমি রাজি আছি। কিন্তু মা তুমি মহা ভ্রমে পড়েছ। বিয়েটা কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। সেই দয়ালু ব্যক্তির

নিকট তোমার কৃতজ্ঞই হওয়া উচিত,—যদি সময় হয় তার সে উপকারের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিয়েতে তার কোন দাবী থাকৃতে পারে না। আর তা ছাড়া সেই যে তোমায় বিয়ে করবে তারও তো কোন নিশ্চয় সম্ভাবনা নেই। মা আর বিবাহে তোমার দেরী করা উচিত নয়,—আমি আবার বলছি আমি তোমার জন্য যে পাত্রটী ঠিক করেছি তাতে নিশ্চয়ই তুমি সুখী হবে।"

তনিমা আর কোন কথা কহিল না,—হৃদয়ের মাঝখানে সে বহুযত্নে যে দেব মন্দির গড়িয়া তুলিতেছিল তাহাতে দেবতার আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেই তাহা যেন একটা সবল ধাক্কা খাইয়া নড়িয়া উঠিল। বরদাবাবু আবার বলিলেন, "কথা ঠিকই রইলো মা আমি দু'চার দিনের ভেতর সেই পাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হব। বিবাহ ভগবানের হাত, যার সঙ্গে যার হবার হবে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। তার জন্যে মনে কোন রকম কিন্তু রাখা উচিত নয়।"

তনিমা এবারও কোন কথা কহিল না,—অনুপমা বলিল, "হ্যাঁ বাবা সেই ভালো!"

তাহার পর সে তনিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চ সই বাগানে যাই।"

সইয়ের কথা বোধ হয় তনিমার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল না,—তাহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে পাষান হইয়া গিয়াছিল। বরদাবাবু আর কোন কথা কহিলেন না;—অনুপমা তনিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বরদাবাবুর এক পিসি ছিলেন, তাঁহার বয়স যথেষ্টই হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শ্রবণ শক্তির প্রখরতা ও চোক্ষের জ্যোতির একটুও হ্রাস হয় নাই। বরদাবাবুরই বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হইয়াছে,—ইনি হইলেন আবার তাঁহার পিসি; কাজেই তাঁহার বয়স সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, সেটা সট্‌কের কোটার প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এত অধিক বয়স সত্ত্বেও তাঁহার দেহ এক্ষণেও বেশ শক্ত সামর্থ ছিল। কাল তাহার দেহ স্থানে স্থানে লোল করিয়া আনিলেও দন্তের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার মিসি দেওয়া দাঁত দুইপাটী যেন দেবতার বরে অটুট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি এখনও অনায়াসে চাল ছোলা ভাজা চিবাইয়া খাইতেন। তিনি প্রাতঃকাল হইতে এখনও যেরূপ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতেন আজকালকার দিনে তাহা করা অসম্ভব।

অনুপমার সহিত এই পিসিটির বড় ভাব, সে পিসিটিকে আগ্নিবুড়ী বলিয়া সম্বোধন করিত, পিসি তাহাতেই সন্তুষ্ট।

অনুপমা এই পিসির ঘরেই রাত্রে শয়ন করিত, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিসিতে, নাতনিতে নানা গল্পগুজব হইত তাহার পর উভয়ে বকিতে বকিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িত। অনুপমা বরাবর হইতে পিসির গৃহে শয়ন করিয়া আসিতেছে বলিয়া তনিমারও তাহার সইএর সহিত সেই গৃহেই শয়নের বন্দোবস্ত হইল। আহারের পর শয়নের জন্য যখন দুই সইয়ে আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তখন পিসি গৃহের মেঝের উপর বসিয়া কড়মড় করিয়া চাল ছোলা ভাজা চিবাইতে ছিলেন। অনুপমা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আহ্লিবুড়ি তোমার এখনও খাওয়া হয়নি বুঝি ?"

পিসিকে অনুপমা আহ্লিবুড়ি বলিয়া ডাকিত,—অন্যান্য বুড়ির মত তাহাতে পিসি অনুপমার উপর কোন দিনই অসন্তুষ্ট হন নাই বরং তাহাতে আরও সন্তুষ্ট হইতেন। অনুপমার কথায় পিসি একগাল চাল ছোলা ভাজা মুখে ফেলিয়া সেগুলো চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "বলি হ্যালা তোরা হ'লি কি বল দেখি! আমাদেরওতো এককাল ছিল,—আমরাওতো এক সময় তোদের মত বয়সের ছিলুম,—কিন্তু এমন বেহায়াপানা তো আমাদের সাত পুরুষে ছিল না। বলি হ্যালা তোরা হ'লি কি বল দেখি ?"

অনুপমা পিসিকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "নূতন আর হবো কি পিসি,—যা ছিলুম তাই আছি। দুঃখের কথা বলবো কি পিসি এক চুলও এদিক ওদিক হয়নি। আমরা মেয়েমানুষ ছিলুম হঠাৎ পুরুষও হয়ে পড়িনি,—ছুড়ি ছিলুম একেবারে বুড়িও হয়ে যায়নি। হাঁ আদ্যি বুড়ি আমাদের নতুন আবার কি দেখ্‌লে ?"

পিসির তখন চাল ছোলা ভাজা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তিনি চাল ছোলার ধামিটা মেঝের উপব নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "তোরা পুরুষ কি,—তোরাতো পুরুষের বাবা হয়ে দাঁড়িয়েছিস্। বলি হালা তোদের লজ্জা সরম কি একটুও নেই,—বাপের মুখেব উপর সটাং কিনা বল্‌লি বিয়ে করবো না। আবার না কোন দিন বলে বসিস্ আমার সয়ম্বরা হবে। ভাতারের গলায় সভার ভেতর মালা পরিয়ে নিজের ভাতার নিজে বেচে নিবি।"

অনুপমা এতক্ষণে পিসিঠাক্‌রুণের কথার মর্ম্মটুকু উপলব্ধি করিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা আদ্যি বুড়ি এবারতো আমরা স্বয়ম্বর হয়েই বিয়ে করবো। যে দিনকাল পড়েছে,—এতে আর বাপের মুখ চেয়ে বসে থেকে আর কি হবে বল্! নিজেদের বিয়ে নিজের হাতেই নেওয়া ভালো ? এতে বাপেরও সুবিধে মেয়েরও যথেষ্ট সুবিধে। বাপকে আর মেয়ের বিয়ের কোন

চিন্তা কর্ত্তে হবে না ; আমাদের সমাজ থেকে পণ প্রথা উঠে যাবে। মেয়ে হ'লে বাপ মার আর বুক শুকিয়ে কাট হয়ে যাবে না,—বরং আনন্দই হবে।"

আন্তিবুড়ি চাল ছোলা ভাজার ধামীটা নামাইয়া রাখিয়া সম্মুখস্থ রেকাবী হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া মুখে ফেলিয়াছিলেন ; বলিলেন, "তোরা তা পারিস্। লেখাপড়া শেখা মেয়ে তোরা তোদের কি আর লজ্জা সরম আছে। আমার বাপের বাড়ীর দেশে এক লেখা পড়া শেখা মেয়ে ছিল,—সে জুতো পরে মোজা পরে রাত্তির দিন ধেই ধেই করে নাচতো। তোরা যখন লেখাপড়া শিখিছিস্ তখন একটা না একটা ঢলানপানা না করে কি ছাড়্‌বি। তখন দুশোবার বরদাকে বলেছি যে, বরদা মেয়েকে লেখাপড়া শেখাস্‌নি। মেয়ে তো তোর আর জজিয়তী কর্ত্তে যাবে না,—আর সদরওয়ালাও হবে না। তা তখন কি আমার সে কথা কাণে গেল,—বরদার যে ওইটাই দোষ। কি এক বাতিক হয়েছে লেখাপড়া শিখুক,—মেয়ে মানুষ কি লেখাপড়া শিখে ধুয়ে খাবে।"

অনুপমা ও আন্তি বুড়ির সহিত এতক্ষণ কথা বার্ত্তা হইতেছিল,—তনিমা একটীও কথা কহে নাই। এতক্ষণে সে ধীরে ধীরে

বলিল, "ঠানদিদি লেখাপড়া শেখা কি আমাদের অন্যায়। লেখাপড়া শিখলে কত জ্ঞান হয়,—কত বিষয় জানা যায়। ঠান-দিদি তুমি যদি এখন একটু লেখাপড়া শেখ তবে বুঝতে পারো লেখাপড়া শেখাটা কি পুরুষ কি মেয়ে প্রত্যেক লোকেরই শেখা কত দরকার। সই কাল থেকে তুই ঠানদিদিকে একটু একটু পড়াস দেখি।"

আন্থি বুড়ির তখন আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল,—তিনি ঘটাটা তুলিয়া লইয়া আলগোছে ঢক্ ঢক্ করিয়া খুব খানিকটা জল খাইতে-ছিলেন। তনিমার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র বলিলেন, "না ভাই আমাকে আর লেখা পড়া শিখিয়ে কাজ নেই,—আমারতো আর তোদের মত বয়সও নেই আর সয়ম্বরাও হতে হচ্ছে না। আমাদের সময়ে ছিল রান্নাবান্না সংসারের কাজ কর্ম্ম শেখাই মেয়েমানুষের প্রধান ধর্ম্ম এখন হয়েছে লেখাপড়া। সংসারের কোন কাজ কর্ম্মই জানেন না শুধু জানেন লেখাপড়া আর জানেন ভাবোন কর্ত্তে। ঠোটে গালে রং দিয়ে লোকের সামনে বেরুতে তোদের তো একটু লজ্জাও করে না। লেখাপড়া শিখেছিস্ যখন তখন আর তোদের লজ্জার দরকার কি! লেখাপড়া শেখা মেয়েরা আমি শুনেছি নাকি স্বামীর কাণমলে দেয়,—গুরু পুরুত বাড়ী

ঢুকলে একটা গড় করাতো দূরের কথা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। আচার ধর্ম্ম কিছুই মানে না। একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে যায়।"

অনুপমা পিসির মুখের সম্মুখে হাত দুইখানা নাড়িয়া বলিল, "আম্বিবুড়ির যেমন কথা, আমরা লেখাপড়া শিখে একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি কিনা! আমরা তো আর কোন কাজ কর্ম্ম শিখিনি!"

আম্বিবুড়ি মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তুই আর মুখ নাড়িস্‌নি ভাই, তোর কোন্ যোগ্যতা আছে আমায় বলতো? রান্নাবান্না সে তো দূরের কথা,—সংসারের কোন কর্ম্মটা কর্ত্তে পারিস বলতো! দুটো পান সাজ্‌তে গেলেওতো তাতে চুণ খয়ের সমান দিতে পারিস্‌নি। শিখিছিস্ কেবল বই পড়তে আর উল্ বুন্‌তে। স্বামীর ঘরে গিয়ে তোরা তো আর সংসারের কোন কাজে আসবিনি,—সেজে গুজে ভাবোন দিয়ে পটের বিবিটির মত শুধু বসে থাক্‌বি। তোদের লেখাপড়া শিখে শুধু ওপরের বাহার বেড়েছে ভেতরেতো কোন সার নেই।"

আম্বি-বুড়ির কথায় অনুপমার ঠোঁট দুইটি ফুটিয়া উঠিল,—সে মুখখানি একটু ম্লান করিয়া বলিল, "আমি না হয় রান্নাবাড়া জানিনি কিন্তু আমার সইতো তেমন নয়। সংসারের সে কোন কাজটা জানে না বল? লেখা পড়া শিখ্‌লেই বুঝি আর কেউ সংসারের

কাজ কর্ম্ম শেখে না। সই ভাই তুই কাল রেঁধে আন্তি-বুড়িকে খাওয়াবী। দেখ দেখি খেয়ে ;—সই আমার কেমন রাঁধে।"

আন্তিবুড়ি মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "ও ভালোমানুষের ঝিকে আমি কোন কথা বল্‌তে যাবো কেন বল! তুই যে থুবড়ী মাগী হ'লি, সংসারের কোন কাজ কর্ম্ম শিখ্‌লিনি,—শ্বশুর বাড়ী গিয়ে যে দুশো মুখনাড়া খাবি,—আমাদের দুশো কথা শুন্‌তে হবে তার তো একবারও হুস্ করিস্‌নি? দিন রাত্তির তো ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস্,—সংসারের কাজ কর্ম্ম শেখার কি তোর কোন মন আছে!"

অনুপমা মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "মন আছে কিনা কাল বুঝতে পারবে। সইএর হাতের রান্না খেলে এ জন্মে ভুলতে পারবে না। আমার সই একা পঞ্চাশজন লোককে রেধে খাইয়ে দিতে পারে।"

আন্তিবুড়ি মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিলেন, "নে এখন শুবি চ রাত ঢের হয়েছে। আমাকে আর রেধে খাওয়াতে হবে না,—বুড়ো মাগী হলি এখনও বিয়ে হ'লো না, তোদের হাতের কি আর জল শুদ্ধ আছে? আমার যত দিন হাড় ক'খানা বজায় আছে দুটো আলো চাল শেদ্ধ নিজেই করে নিতে পারবো। তোদের হাতে খেয়ে শেষ বয়সে কি জাত ধর্ম্ম খোয়াবো!"

তনিমা এতক্ষণ আম্মিবুড়িব কথায় কোন উত্তর দেয় নাই। নীরবে একপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিল,—এতক্ষণে আবার কথা কহিল, "ঠানদিদি আমাদের হাতে খেলে কি তোমার জাত যাবে? আমরা তোমার নাত্‌নি;—নাতনির হাতে খেলে কি কারুর জাত যায়! আমরা তো আর অজাত কুজাতের মেয়ে নই। বিয়ে না হ'লে যদি হাতের জল শুদ্ধ না হয়,—তাহ'লে বিধবা হ'লেও তো হাতের জল অশুদ্ধ হওয়া উচিত। আমরাও তো বল্‌তে পারি যে, ঠান্‌দিদি তুমি বিধবা তোমার হাতের জল শুদ্ধ নয় আমরা তোমার হাতে খাবো না।"

ঠানদিদি তখন শয়ন কবিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তনিমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অততো বাছা জানিনি,—শাস্ত্রের কথা যেমন শুনিছি তেমনি জানি। তা বাছা তোমাদের হাতে কি আর খাব না,—খাব বইকি;—দু'দিন পরে যখন তোমাদের বিয়ে থা হবে তখন কত রেধে খাওয়াতে পারো দেখবো।"

অনুপমা মহা বিরক্তভাবে বলিল, "আম্মিবুড়ির যেমন কথা,—আমাদের যখন বিয়ে হবে তখনতো আর আমরা শ্বশুর বাড়ী যাব না,—এখানে বসে থেকে ওকে বেধে রেধে খাওবো। বয়স হয়ে ভীমরতী হয়েছে কিনা ভাই অমন ছুচিবাই হয়েছে।"

আন্তিবুড়ি মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তা ভাই তোমরা যাই বল,—তোমাদের বিয়ে না হ'লে আমি তোমাদের হাতে খাচ্ছিনি।"

বরদাবাবু বাহির মহল হইতে ভিতরে শুইতে যাইতেছিলেন, তিনি পিসির ঘরের ভিতর কন্যা ও পিসির কণ্ঠস্বর পাইয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বরদাবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তনিমা বেশ একটু সঙ্কোচিত হইয়া বসিল। বরদাবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্তির অবধি তোরা এখন ঘুমুসনি! বসে বসে কি গজর গজর কচ্ছিস। রাত হয়েছে,—এখন সব শো।"

পিতা নীরব হইবা মাত্র অনুপমা বরদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা আন্তিবুড়ি বল্‌ছে,—আমাদের হাতের জল খেলে ওর নাকি জাত যাবে। আমাদের হাতের রান্না খেলে কি বাবা, আন্তিবুড়ির জাত যাবে?"

বরদাবাবু মৃদু হাসিলেন; হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "জাত কি কারুর যায় মা,—শুদ্ধ অশুদ্ধ ওটা কেবল মনের বিকার বৈ তো নয়। এক ভগবানেরই সমস্ত মানুষ সৃষ্টি যখন তখন কি

আর জাত অজাত আছে মা। জগতের সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হবার জন্যে, সমাজ এই শ্রেণী বিভাগ করে দিয়েছে বইতো নয়। পিসিমার যদি তোমাদের হাতে খেতে শ্রদ্ধা না হয়, তিনি নাইবা খেলেন,—তিনি চিরকাল নিজের হাতে রেঁধে খেয়ে আসছেন তাঁর কি যার তার হাতে খেতে শ্রদ্ধা হয়। এর ভেতর জাত যাবার তো কিছুই নেই মা।"

পিসি ঠাক্‌রুণ তাঁহার ভাইপোর কথায় বেশ একটু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শুনছিস্ বরদা মেয়েদের কথা, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,—আমি কি না এখন ওদের রান্না ভাত খাবো। ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে হ'লো এখনও বিয়ে দিলিনি ওদের হাতের কি জল শুদ্ধ আছে। তোকেও বলি বাছা, মেয়ের বিয়ে দেবার তোরও তো কোন চাড় নেই। আমরা হিন্দু আমাদের ঘরে কি এত বড় মেয়ে করা ভালো। লেখাপড়া শিখে তোর যে একেবারে ম্লেচ্ছের কারখানা হয়েছে।"

বরদাবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না পিসি আমি হিন্দু পুরোপুরিই আছি। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা কচ্ছি, শিগ্‌গিরই বিয়ে দেব। নিতান্ত ন'দশ বৎসরের মেয়ের বিয়ে দেওটা আমি ঠিক ভাল মনে করিনে। মেয়ের একটু জ্ঞান বুদ্ধি না হ'লে,

অন্ততঃ স্বামী কি সেটুকুও বোঝবার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মতে মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।”

পিসি ঠাকুরুণ মুখখানা একটু ভার করিয়া বলিলেন, “কি জানি বাছা তোমরা কি বোঝ! কালে কালে আরও কত হবে।”

বরদাবাবু পিসি ঠাকুরুণের কথার আর কোন উত্তর দিলেন না,--তিনি তনিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি মা তোমার এখানে শুতে কোন কষ্ট হবে নাতো?”

তনিমা মৃদু হাসিয়া ছোট্ট একটু ঘাড় নাড়িল। বরদাবাবু গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, দরজার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “রাত ঢের হয়েছে,--আর রাত জেগ না। এইবার সকলে ঘুমুবার চেষ্টা কর।”

বরদাবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবা মাত্র অনুপমা একগাল হাসিয়া বলিল, “আস্তিবুড়ি এইবার তোমায় একটা গল্প বল্‌তে হবে। সই একদিনের জন্যে এসেছে, তাকে তোমার গল্প শোনাতেই হবে। সেই তোমার বিয়ের গল্পটা বলো! সেই তোমার বর ছাঁদনাতলা থেকে কেমন করে মানিয়ে ছিল।”

পিসি ঠাকুরুণ তনিমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “শোন মেয়ের কথা, মেয়ের বাপ বলে গেল ঘুমুতে,—ওনি বল্‌ছেন কিনা

গল্প বলো। মেয়ের কি কারুকে ভয় ডর নেই। না বাছা আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে, আমি আর গল্পটল্প বল্‌তে পারবো না। তোমাদের ইচ্ছে হয় ঘুমুও না হয় যত পারো দু'জনে মিলে গল্প কর।"

তনিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "না ঠান্‌দি, তোমায় আর গল্প বল্‌তে হবে না,—তুমি ঘুমোও।"

পিসি ঠাকরুণ আর কোন কথা না বলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

জননীর সন্ধানে নির্ম্মল অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিল। কাল অনেক রাত্রে সে রামনগর কাছারি হইতে ফিরিয়াছে,—রাত্রে জননীর সহিত বিশেষ কোনই কথা হয় না। প্রাতে ভৃত্য আসিয়া যখন সংবাদ দিল, জননী ডাকিতেছেন,—তখন তাহার বুকের রক্ত বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। জননী কি জন্য ডাকিতেছেন,—তাহার আভাস যেন স্মৃতি বিস্মৃতির ভিতর দিয়া তাহার চারি পার্শ্বে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জননীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাসনাদেবী তখন সবে পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তখনও তাহার পরিধানে পট্টবস্ত্র—গলায় তুলসির মালা। পুত্রকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিমু এখন তো কাছারির কাজ মিটেছে,—এইবার একবার সদরে গিয়ে বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা

কর। তিনি অমন করে চিঠি লিখেছেন,—যখন তখন আর দেরি করা উচিত নয়।"

নির্ম্মল জননীর এই পট্ট বস্ত্র পরিধান,—কণ্ঠে তুলসীর মালা—কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোটা মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়াছিল। হিন্দু অন্তঃপুরের এই পবিত্র ধর্ম্মচারিনী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার সমস্ত দেহটা যেন পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর স্বর যেন মহাদেবীর আদেশের মত নির্ম্মলের কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে জননীর কথায় উত্তর দিল,—"মা তুমি যখন বলছ তখন আর দেরী করবার কোনই কারণ নেই। আমি আজই সদরে রওনা হব। সন্ধ্যার পর এখন থেকে রওনা হ'লে কাল সকালেই সদরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো। আজই যাতে রওনা হতে পারি,—আমি এখনি তার বন্দোবস্ত কর্ত্তে যাচ্ছি।"

বাসনাদেবী পুত্রের কথায় বেশ একটু সন্তুষ্ট হইলেন,—তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা তুমি আজই রওনা হও। শুভ কাজে দেরী করা কিছু নয়। মেয়েটি যদি ভালো হয়,—তাহ'লে যেন আর না বলিসনি,—কথাবার্ত্তা একেবারে পাকা করে আসিস্। বরদাবাবু যখন বলেছেন পাত্রীটি ভালো,—তখন মেয়েটি নিশ্চয়ই ভালো। বিয়ে-থা-করে ঘর সংসার কর আমিও একটু নিশ্চিন্ত

হই। এখনও যদি তোর সংসার নিয়ে বসে থাক্‌তে হয় তাহ'লে কবে আর আমি তীর্থ ধর্ম্ম করবো বল ?"

ঘর সংসার করিবার তো নির্ম্মলের অসাধ নাই। কিন্তু যাহাকে লইয়া ঘর সংসার করিবে সে কোথায় ? আজ দুই বৎসর সেতো দিন রাত্র তাহারই অন্বেষণ করিতেছে,—কিন্তু সে যে বিদ্যুৎতের মত তাহার হৃদয়াকাশে নিমিষের জন্য চমকাইয়া সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে,—এত দিনও তো তাহার সন্ধান মিলিল না। নির্ম্মল জননীর কথায় উত্তর দিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না,—নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। বাসনাদেবী একটু-খানি নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওনি যদি বেঁচে থাক্‌তেন তাহ'লে এতদিন কোন কালে তোর বিয়ে হয়ে যেত। তোর বিয়ের জন্যে কি আমায় এমন করে ভাব্‌তে হয়। আমার সাত নয় পাঁচ নয় তুই একটী মাত্র ছেলে,—তোরই মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি। আমার কি সাধ যায় না বাবা,—যে তোর বিয়ে দিয়ে লাল টুক্‌টুকে একটী বৌ ঘরে আনি! তোর সংসার তার হাতে বুঝিয়ে পড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে কাশীবাসী হতে পারি। ছেলে যদি বিয়েতে এমন উদাস হয়ে থাকে, তাহ'লে কি মায়ের প্রাণে সুখ থাক্‌তে পারে ?"

জননীর এই বেদনা ভরা কথাগুলি একটা মহা বেদনার সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মলের প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল। বরদাবাবু যে পাত্রীটি ঠিক করিয়াছেন,—তাহাকেই সে বিবাহ করিবে এমন কথা সে কেমন করিয়া জননীকে বলিবে? যে প্রতীমাখানি সে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়াছে, আজ দুই বৎসর তাহারই ধ্যানে বিভোর হইয়া আছে, বরদাবাবুর নির্ব্বাচিত পাত্রী যদি তাহার সে প্রতীমা না হয়! অপর কাহাকেও সে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে না,—সুখী হওয়া অসম্ভব। স্মৃতির আঘাতে সে নিজেও সুখী হইতে পারিবে না, তাহার আচরণে এক সরলা-বালাও চিরদিন অসুখী হইবে। জানিয়া শুনিয়া এক সরলাবালাকে সে কেমন করিয়া চিরদিন কাঁদাইবে। ধর্ম্মতো তাহা কোন দিন সহ্য করিবে না। সে জননীর কথার উত্তরে অতি মৃদুস্বরে বলিল,, 'মা, পাত্রী যদি পছন্দ হয়, আমি তাহ'লে পাকাপাকিই বন্দোবস্ত করে আসবো। তবে যদি—"

বাসনাদেবী পুত্রকে আর কথা কহিতে দিলেন না,—পুত্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "এখনও আর তবে যদি করিস্‌নি। বাবা তুইতো আমার অবাধ্য ছেলে নস্‌,—বিয়ে না করে মায়ের প্রাণে ব্যথা দিস্‌নি। যদি মেয়েটি মাঝামাঝিও হয় তাহলেও কথা

পাকা করে আসিস্। মায়ের কথা রাখলে কি কেউ অসুখী হয়। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তুই তাকে নিয়েই সুখী হবি। ওনি নেই, তোর মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি। আমার শেষ সাধটা অপূর্ণ রাখিস্নি।"

স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে আঘাত করায়, চক্ষের কপাট খুলিয়া, টস্টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল বাসনাদেবীর গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন। জননীর নয়নে অশ্রু দেখিয়া নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পিতা, নাই, জননীর সুখ দুঃখের ভার সমস্তই তাহার উপর। তাহার নিজের একটুখানি সুখের জন্য সে সেই জননীর নয়নে কেমন করিয়া অশ্রুধারা বহাইবে। তাহার প্রাণ যদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায় তাহা হইলেও তো সে, সে কাজ কিছুতেই করিতে পারে না। সে নিজের সুখ চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিতে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হইল। জননীর কথার উত্তরে একেবারে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মা, বরদাবাবু যে পাত্রীটি ঠিক করেছেন তাকে আমি বিয়ে কল্লে যদি তুমি সুখী হও,—আমি বল্ছি আমি তাকেই বিয়ে করবো, সে মেয়ে আমার পছন্দ হক আর না হক।"

বাসনাদেবী বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বাবা পছন্দ তোর হবেই। বরদাবাবু তোর জন্যে যে পাত্রীটি ঠিক করেছেন সে যে কুৎসিত নয় তা, কিন্তু আমি তোকে জোর করে বল্‌তে পারিনি। মনে কোন রকম কালি রাখিস্ নি। মন স্থির করে প্রাণ খুলে আমায় কথা দিয়ে যা,—যে এসে তুই আমায় সু-খবরই শোনাবী।"

নির্ম্মলের সমস্ত হৃদয়ে দরদর করিয়া কাঁপিতে ছিল, "সে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "মা আমি যখন তোমায় কথা দিয়েছি, তখন তা আর নড়চড় হবে না। পাত্রীর পক্ষে যদি কোন রকম আপত্তি না উঠে তাহ'লে যেনো এ বিয়ে পাকা।"

বাসনাদেবীর ম্লান মুখখানির ভিতর হইতে একটা আনন্দ-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, নির্ম্মল তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে দৃঢ়স্বরে আবার কি বলিতে যাইতেছিল, "সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল," একটী বাবু আসিয়া ছোটবাবুকে খুঁজিতে কল্‌কাতা থেকে এসেছেন। তিনি একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চান।

জননী ও পুত্র বিস্মিত ভাবে উভয়েই ভৃত্যের মুখের দিকে

চাহিল। নির্ম্মল ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কল্‌কাতা থেকে এসেছে, কি রকম দেখ্‌তে, কি নাম তার ?"

ভৃত্য চক্ষুর পল্লব বার তুই নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সেটাতো জিজ্ঞাসা করিনি !"

নির্ম্মল, "কেবলমাত্র বলিল, "আচ্ছা যা তুই,—বসতে বল্‌গে যা,—আমি যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল,—নির্ম্মল কলকাতা হইতে কে আবার ভদ্র লোক আসিয়াছে তাহাকে দেখিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, "বাসনাদেবী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহ'লে আজইতো তোর সদরে যাওয়া স্থির।"

নির্ম্মল ফিরিয়া দাড়াইয়া বলিল, "হা মা স্থির,—আমার বিয়ে দেওয়াই যখন তোমার একান্ত ইচ্ছে মা, তখন আর না যাওয়ার কোনই কারণ নেই।"

বাসনাদেবী পুত্রকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, নির্ম্মলও ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মায়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া নির্ম্মল একেবারে বাহির বাটীর বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবেশ করিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। একি ! উপেন তাহাদের দেশে কোথা হইতে

আসিল। উপেনকে বৈঠকখানা গৃহে একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, নির্ম্মল বেশ একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কোথা থেকে এলে ?"

নির্ম্মলকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া উপেন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল,—হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, "তুমি তো একেবারে পুরোনো বন্ধুদের ভুলেই গেছ,—তাই একবার দেখ্‌তে এলুম আমাদের চিন্‌তে টিন্‌তে পার কিনা ? মাঝে একবার খবর নিয়েছিলুম, তখন শুন্‌লুম নাকি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছ। কোথায় গেছ কি বৃত্তান্ত তা বড় একটা কেউ জানে না। এবার সন্ধান নিয়ে জান্‌লুম তুমি বাড়ীতেই আছ ; কাজেই একবার দেখা কর্ত্তে এলুম।"

নির্ম্মল একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বন্ধুর পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিল, "ভাই উপেন,—আজ তোমাকে এখানে দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা তোমায় মুখে বলবার নয়। কিন্তু আমি যে সন্ন্যাসী হয়ে গেছলুম এ সংবাদটা হঠাৎ তোমায় আবার কে দিলে !"

উপেন আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "সংবাদ রাখলেই সব সংবাদ পাওয়া যায়,—তুমিতো আমাদের কোন সংবাদ রাখনা

কাজেই কোন খোঁজ পাও না। সে যাক্, পড়াশুনো তো ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বাড়ী এসে বসেছ, বলি বিয়ে থা কল্লে ?”

আবার সেই বিয়ে! নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ঘরে বাহিরে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া কেবল বিয়ে বিয়ে রব উঠিয়াছে। কিন্তু সে যাহাকে বিবাহ করিবে ভাবিয়াছিল সে কোথায় জলের বুদবুদের মত একবার-মাত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই অনন্ত বারিধির সহিত মিশিয়া গিয়াছে! বন্ধুর কথায় সে প্রথম একটু থতমত খাইয়া উত্তর দিল, “না বিয়ে এখন হয়নি বটে,—কিন্তু মা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; কাজেই বোধ হয় এইবার বিয়ে কর্ত্তে হবে!”

উপেন মাথাটা নাড়িয়া বলিল, “আমরা ভেবেছিলুম বুঝি আমাদের ফাঁকিদিয়ে বিয়ে থা গুলো সেরে ফেলেছ। তবু যা হক একদিন লুচি খাওয়া যাবে। তাহ’লে বিয়েটা কতদিন নাগাৎ হবে ভাবছো?”

নির্ম্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “কবে নাগাৎ হবে তা কি করে বল্‌বো বল। বিধির-বিধি তো কেউ খণ্ডন কর্ত্তে পারে না। বিয়ে হবে কি না তাওতো কেউ বলতে পারে না। যাক্ সে সব বাজে কথা, এখন আসল সত্যি কথা বল দেখি তুমি

হঠাৎ এদিকে এলে কেন,—আর আমার এত খবরই বা তুমি পেলে কোথায় ?”

উপেন হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমিতো তোমাদের এদিকে প্রায়ই আসি, আমার যে বোনের বিয়ে তোমাদের দেশের পাশেই হয়েছে। সেবার যখন এসেছিলুম তখন তোমার খবর নিয়েছিলুম,—শুনলুম তুমি দেশে নেই কোথায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছ। তারপর আর অনেক দিন এদিকে আসিনি সম্প্রতি আজ পাঁচ ছয় দিন হ'লো বোনের বাড়ী এসে শুনলুম তুমি বাড়ীতেই আছ। তুমি তো আমাদের কোন খোঁজ খবর নাও না, এতদূর যখন এসেছি ভাবলুম একবার দেখা শুনাটা করে যাই। ভালো কথা মনে পড়েছে, তোমার সে রাসের রোমান্সের কি হ'লো ?”

দাঁ করিয়া কে যেন সজোরে ঠিক হৃদপিণ্ডের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ঘুসি মারিল; নির্ম্মলের হৃদপিণ্ডটা একেবারে বুকের ভিতর বসিয়া গেল। সে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “কই তারতো কোনই সন্ধান পেলুম না। তুমি তো সবই জান, শান্তিপুরেতো তাদের কোন সন্ধান পাইনি, এই দু'বৎসর কত জায়গা ঘুরলুম কিন্তু সেই মেয়েটির আর

কোথায়ও সন্ধান পেলুম না। আমার বোধ হয় তারা মারা গেছে। তুমি যদি আমাকে সে দিন জোর করে ধরে নিয়ে না আস্‌তে, তাহ'লে তারা অমন করে ভেসে যেত না।"

নির্ম্মলের যে এখনও সেই ভিখারী বালিকাটার কথা মনে আছে,—এ কথা উপেন একেবারে কল্পনাই করিতে পারে নাই। সে কথাটা কেমন একটা বিদ্রূপের ছলেই বলিয়াছিল। কিন্তু বন্ধুর ভাবে সে বেশ একটু বিস্মিত ভাবে বলিল, "আশ্চর্য্য যে আজ এই দুই বৎসরেও তুই সেই ভিখারী মেয়েটাকে ভুল্‌তে পারিসনি!"

নির্ম্মলের মুখের উপর একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "এতে আশ্চর্য্যের কি দেখলে? আমি তাকে দেখেছি, তার স্বর শুনেছি আমি যদি তাকে না ভুলে থাকি সেটা আশ্চর্য্যের কিছুই নয়, কিন্তু তুমিই বা কোন্ ভুলতে পেরেছ। তুমি তাকে দেখনি তার মধুর স্বরও শোননি, কেবল আমার মুখে শুনেছ তাতেই যখন তোমার এখনও তার কথা মনে আছে, তখন আমি কেমন করে ভুলবো বল!"

উপেন গাঢ় স্বরে বলিল, "ঠিক কথা। তুই কি তাকে বিয়ে কর্ব্বি স্থির করেছিলি নাকি? এখন আবার মত পরিবর্ত্তন করলি কেন?"

নির্ম্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি করবো বল, যার অনুরোধ, বিধির-বিধি যা লেখা আছে তাতো হবে। মানুষের সুখ দুঃখের ওপব নির্ভর করে সে লেখাতো আর বদলায় না। সে কথা যাক্ এখন তুমি বিয়ে টিয়ে করেছ! পড়াশুনো এখনও হচ্ছে নাকি!"

উপেন গম্ভীর ভাবে বলিল, "বিয়ে-থাও করিনি,—লেখা পড়াও ছাড়িনি। এম, এটা, পাশ করে সম্প্রতি কিছুদিন লেখা পড়াটা স্থগিত রেখেছি। এইবার কল্‌কাতায় ফিরে আইন ঘানিতে নিজেকে জুড়ে দেওয়া যাবে আর কি?"

তাহার পর কথায় কথায় দুই বন্ধুতে পুরাতন অনেক কথাই হইল। নির্ম্মলের অন্য পাত্রী দেখিতে যাইবার কথা আছে সে কথাও উঠিল। নির্ম্মল বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি যখন এত কষ্ট করে বন্ধুকে দেখতে এতদূর এসেছ তখন আর একটু কষ্ট করে আমার নির্দ্ধারিত পাত্রীটিকে একবার দেখে আসবে চল।"

উপেন প্রথম নানা ওজর আপত্তি করিয়া বন্ধুর কথায় সম্মত হয় নাই কিন্তু শেষ নির্ম্মলের একান্ত জেদাজেদীতে পড়িয়া সম্মত হইতে হইল। সে শেষ বলিল, "তুমি যখন নিতান্ত ছাড়বে না তখন কাজেই আমায় যেতে হবে কিন্তু আমি আগেই বলে

রাখছি আমি আর এখানে ফিরবো না বরাবর কল্‌কাতায় চলে যাব।"

নির্ম্মল তাহাতেই সম্মত হইল, সে বন্ধুর আদর যত্নের জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উপেন আশায় সেদিন আর তাহাদের পাত্রী দেখিতে যাওয়া হইল না, পরদিন প্রত্যূষে দুই বন্ধুতেই রওনা হইবে সেইরূপ বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধুতে পাত্রী দেখিবার জন্য পরদিন প্রত্যূষেই নৌকারোহনে যাত্রা করিল। মধ্যাহ্ন ভোজনটা নৌকাতেই সারিতে হইবে, পাচক তাহার সরঞ্জাম লইয়া সঙ্গে চলিল। নির্ম্মল যে বজরা-খানায় সদরাভিমুখে রওনা হইল সেখানি তাহার নিজের। বজরা-খানা খুব প্রকাণ্ড না হইলেও তাহার বিশেষত্ব ছিল এই, সেটা অন্যান্য বজরা অপেক্ষা অনেক দ্রুত চলিত। অন্যান্য বজরায় প্রত্যূষে ছাড়িয়া সদরে উপস্থিত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইত সেই স্থানে নির্ম্মলের বজরা সন্ধ্যার পরেই সদরে যাইয়া উপস্থিত হইত। বজরার কক্ষে বসিয়া দুই বন্ধুতে নানা কথা কহিতে কহিতে নদীর দুই তীরের শত শোভা উপভোগ করিতে লাগিল। নদীর জলে কল্লোল তুলিয়া বজরা নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ উঠিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া বজরায় আসিয়া লাগিতেছে,—একটা ক্ষীণ বিরহ সঙ্গীতের কুলু কুলু ধ্বনি চারিদিকে যেন একটা মহা শান্তি ছড়াইয়া দিতেছে। নির্ম্মল এই বিরহিনী

নদীর দিকে চাহিয়া,—তাহার কুলু কুলু বিরহ সঙ্গীত শুনিয়া তাহার পাওয়ার চেয়ে পাওয়াব আশাব অনন্দ যে কত মধুব তাহাই ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার মাঝেও সে যেন বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

নির্ম্মল নদীব দিকে চাহিয়া নদীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় উপেনেব কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সে যেন স্বপ্নের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠিল; উপেন বলিল, "পাত্রীটি কেমন, কিছু শুনেছ?"

নির্ম্মল বন্ধুর দিকে চাহিয়াছিল, বলিল, "সদবের উকিল বরদা-বাবুর সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মা তাঁকেই আমার বিয়ের একটী পাত্রী অনুসন্ধান করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন, তিনিই এই পাত্রীটি আমার জন্যে স্থির করেছেন। তাঁর পত্রে যতদূব জানতে পেরেছি তাতে আমার বোধ হয় পাত্রীটি নিতান্ত মন্দ নয়।"

উপেন বেশ একটু আগ্রহ ভবে জিজ্ঞাসা করিল, "সদরেতো উকিল বরদাবাবু ত তিন জন আছে, ইনি কোন বরদাবাবু?"

নির্ম্মল উত্তব দিল, "সদবের প্রধান উকিল বরদা মিত্র!"

তোমাদের পাল্টা ঘর? কিন্তু তার কোন মেয়ে অবিবাহিত আছে কিনা বলতে পারি না।"

উপেন বন্ধুর কথায় মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি বলতে পারি,—আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে এই বরদাবাবুর কি রকম সম্পর্কে এক ভাই হয় তার সঙ্গে হয়েছে। আমি শুনেছিলুম তার এক মেয়ে আছে তার নাকি এখনও বিয়ে হয়নি। কিন্তু বরাৎ যে খারাপ।"

নির্ম্মল বন্ধুকে বাধা দিয়া বলিল, "এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হয়? দেখ যদি বিধি সুপ্রসন্ন হন তা হ'লে বরদাবাবুর মেয়েটির সঙ্গে তোমারও জোড়গাঁথা হয়ে যেতে পারে!"

উপেন তাড়াতাড়ি বলিল, "আর বিধির সুপ্রসন্ন হয়ে কাজ নেই ভাই,—এ বেশ সোজা ঘাড় তুলে চলছি, আর সাধ করে কেন একটা বোঝা ঘাড়ে তুলে নিজেকে কুঁজো করে ফেলি। তোমরা জমিদার লোক বিয়ে টিয়ে ও সব তোমাদেরই সাজে। যাদের খেটে খেতে হবে বিয়ে তাদের জন্যে নয়?"

নির্ম্মল বন্ধুর কথায় বেশ একটু হাসিয়া লইয়া বলিল, "তুমি যা বল্লে সেটা ঠিক উল্টো। যাদের খেটে খেতে হবে তাদের জন্যেই বিয়ে? আমাদের কাজ কর্ম্ম নেই যখন হয় যাতা খেয়ে নিলেও চলে

কিন্তু যাদের খেটে খেতে হবে তাদের টাইমে ভাতটি না হলেই নয়। বামুন রেখে খাওয়া সকলেরতো অবস্থায় কুলোয় না, অন্ততঃ টাইমে ভাতটা পাবার জন্যেও তাদের বিয়ে করাটা নিতান্তই প্রয়োজন ?”

উপেন বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিল, “শুধু দুটো ভাত রেঁধে দেবার জন্যে বিয়ে করাটা যদি মানুষের প্রয়োজন হয়—তেমন বিয়ে না করাই মঙ্গল। এমন বিয়ে করার চেয়ে দু মাস না খেয়ে থাকাই উচিত। বিয়ে করাটা কি এতই সহজ যে মানুষের শুধু একটু খেয়ালের ওপর তার অস্তিত্ব! আমরা লেখা পড়া শিখিছি আমাদের এ কথা বলা কিছুতেই সাজে না। বিয়ের করার যে কত দায়ীত্ব মানুষ যদি তা ভাবতো তাহ’লে কখনই তারা অমন পাগলের মত বিয়ে কর্ত্তে ছুটতো না!”

বন্ধুর কথার প্রতিবাদে নির্ম্মল কি আবার একটা বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল,—পাচক্ আসিয়া সংবাদ দিল, “রান্না প্রস্তুত, এখন কি আপনারা আহার করবেন ?”

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, “নিশ্চয়ই,—বেলাও ঢের হয়েছে ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে। এখন কি আর কারুর

অপেক্ষা করা চলে। জায়গা করে দিতে বলগে যাও,—আমরা যাচ্ছি!"

পাচক চলিয়া গেল, দু'বন্ধুতে আরও কিছুক্ষণ বিবাহ সম্বন্ধে নানা বাকবিতণ্ডা করিয়া আহার করিতে উঠিয়া গেল। জলের হাওয়ায় বন্ধুদ্বয়েরই ক্ষুধাটা বেশ চন্‌চনে হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই আহারটা বেশ গুরুতর হইল। গুরুতর আহারের পর দেহটাকে বেশ একটা আরাম দিবার জন্য দুই বন্ধুতে বজরার কক্ষের ভিতর একটু গড়াইবার জন্য শয্যার উপর শয়ন করিয়াছিল। নদীর জলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গড়াইতে গড়াইতে কখন তাহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কাহারও খেয়াল ছিল না। সহসা মাঝির বিকটস্বরে নির্ম্মল চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ধড়মড়িয়া একেবারে উঠিয়া বসিল। নিদ্রার আমেজের ভিতর দিয়া মাঝির কথা ভালো তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, সে একটা হাই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি কি বল্‌লে ?"

মাঝি তখন হালে জোর জোর ঝিকে মারিতেছিল,—সে উত্তর দিল, "হুজুর পশ্চিম কোনে একখানা কালো মেঘ বড় বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠে সমস্ত আকাশটা প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, একটু বেশ ঝড় উঠবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বজরা কি কিনারায় ভিড়াব ?"

জলের উপর আকাশে মেঘ কালো হইয়া উঠিয়াছে,—ঝড় হইবার সম্ভাবনা, কথাটা কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র নির্ম্মলের প্রাণটা যেন কেমন ছাৎ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বজরার একটা গবাক্ষ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল। আকাশ তখন কাল মেঘে একেবারে ভরাট হইয়া গিয়াছে। তাহার ছায়া জলে পড়িয়া নদীর জলও কাল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি স্তব্ধ নীরব, গাছের একটীও পাতা পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। নদীর জলেও ঢেউ নাই তাহাও স্থির, ধীর, শান্ত। সহসা যেন বাতাস সাঁই সাঁই করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিবে তাহার সমস্ত লক্ষণই চারিদিকে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বালিসের নিম্নে ঘড়ীটা ছিল, নির্ম্মল তাহা বাহির করিয়া দেখিল। বেলা আর নাই। অপরাহ্ন হইয়াছে,—ঘড়ীর কাঁটাটা পাঁচটার নিকটবর্ত্তী হইবার আর বিলম্ব বড়ই অল্প। সে তাড়াতাড়ি বন্ধুকে ঠেলিয়া তুলিল। উপেন অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। বন্ধুর ধাক্কায় সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া বিহ্বলভাবে বন্ধুর দিকে চাহিতে লাগিল। নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বলিল, "পাত্রী দেখার সাধ বোধ হয় এখানেই শেষ হয়,—আকাশের মেঘের ভাবটা বড় সুলক্ষণ বলে বোধ হচ্ছে না।"

উপেন উঠিয়া বসিয়া মাথাটাকে সজোরে বার দুই নাড়িয়া নিদ্রার ঘোরটা অনেকটা কাটাইয়া লইয়াছিল। নির্ম্মলের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও একবার বজরার একটা গবাক্ষ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল। বাহির হইতে মাঝির কণ্ঠস্বর আবার আসিল, "হুজুর, আকাশের গতিক ভালো বলে বোধ হচ্ছে না,—আমি বজরা কিনারায় ভীড়াই।"

নির্ম্মল ভিতর হইতে উত্তর দিল, "হুঁ, ঝড় উঠ্‌লো বলে, বজরা শিগ্‌গির কিনারায় ভেড়াও।"

ঝড় উঠিতে আর বিলম্ব নাই শুনিয়া উপেনের নিকট হইতে নিদ্রাদেবী বহুদূরে পলায়ন করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আর এর ভেতরে কেন? বজরা যদি ডোবে তাহ'লে এর ভেতর থেকে বেরুতে না পেরে মাথা ঠুকে মরার চেয়ে,—সটাং ডুবে যাওয়া ভালো। চল বজরার বাহিরে গিয়ে দাঁড়াই।"

নির্ম্মল মৃদু হাসিয়া বলিল, "বজরা কি আর সহজে ডুবে,—আর তা ছাড়া ঝড় উঠ্‌তে উঠ্‌তে ততক্ষণ বজরা কিনারায় পৌঁছে যাবে।"

উপেন বজরার কক্ষ হইতে বাহির হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—বলিল, "তবু সাবধানের মার নেই।"

নির্ম্মল মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, “মরনের এত ভয় ?”

“নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই।” উপেন বজরার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। নির্ম্মলও আর কোন কথা না বলিয়া বন্ধুর অনুসরণ করিল। নির্ম্মল বজরার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তাহার দৃষ্টি সম্মুখে পতিত হইল। সম্মুখে একখানি বজরা আসিতেছে। নির্ম্মল বজরাখানা দেখিবা মাত্র চিনিল,—এ যে সেই বজরা,—সেই দুইটি বালিকা ঠিক সেই ভাবেই বজরার ছাদের উপর বসিয়া আছে। বিস্ময়ে আনন্দে নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বজরাখানা তাহাদের দিকেই আসিতেছে, আর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুইখানা বজরা পাশাপাশি হইবে। নির্ম্মল বালিকা দুইটীকে আজ বেশ ভালো করিয়া দেখিবার জন্য ব্যাকুলভাবে বজরার দিকে চাহিয়াছিল,—সেই সময় সজোর পবন তীরের বালুকারাশী উড়াইয়া সাঁই সাঁই রবে দিক্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিল। ধীর, স্থির, শান্ত, নদী, পবনের উৎসাহ পাইয়া যেন উন্মাদিনীর মত নাচিয়া উঠিল। সহসা একেবারে বজরা দুইখানাই নাচিয়া দুলিয়া টলিয়া উঠিল। চারিদিকে সামাল সামাল রব উঠিল।

ঝড় উঠিয়াছে দেখিয়া বালিকা দুইটি তাড়াতাড়ি বজরার ছাদ হইতে নামিয়া আসিতেছিল সহসা একখানা লোগী একজনের পায়ে ঠেকিয়া তাহাদের মধ্যে একজন একেবারে উল্টাইয়া নদীব জলের ভিতর যাইয়া পড়িল। তুফান বলের মত তাহাকে যেন লুফিয়া লইয়া দূরে একেবারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চারিদিক হইতে একটা গেল গেল শব্দ উঠিল। সম্মুখে বালিকা জল মগ্ন হয়,---নির্ম্মলের সমস্ত দেহের ভিতর যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সমস্ত দেহটাকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না,—তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটি খুলিয়া ফেলিয়া,---কাপড়টা মালকোচা দিয়া আটিয়া লইয়া,—সেই প্রবল ঝড়ে,—বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই ঝটিকাময়ী ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী নদী গর্ভে ঝাপাইয়া পড়িল। নির্ম্মল এত সত্বর নদীর ভিতর ঝাপাইয়া পড়িল যে কেহ নিষেধ করিবারও অবসব পাইল না। তুফান ধাক্কায় ধাক্কায় তাহাকে একেবারে বজরা হইতে শত হস্ত দূরে লইয়া গিয়া ফেলিল। নির্ম্মলকে সহসা জলে ঝাপাইয়া পড়িতে দেখিয়া উপেন একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল তখন আর বন্ধুর কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। বাতাসের ধাক্কায় নির্ম্মল যে স্থানে বজরা হইতে

জলে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল বজরা তথা হইতে প্রায় একমাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। উপেন ভালো করিয়া একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল কোথায় কিছুই দেখা যায় না কেবল তুফান দুই তিন হাত উচু হইয়া সমস্ত জল তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে আর এলোমেলো বাতাস সাঁই সাঁই রবে ছুটিতেছে। উপেন মাঝির দিকে ফিরিয়া বলিল, "মাঝি যেমন করে পার যেখানে তোমাব মনিব জলে ঝাপিয়ে পড়েছে সেইখানে বজরা নিয়ে চল প্রচুর বক্‌সিস্‌ পাবে ?"

মাঝি মহা ব্যস্ত ভাবে উত্তর দিল, "হুজুর,—বজরা নিয়ে যাবার জন্য দেখ্‌ছেন না কত চেষ্টা করেছি কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় বজরা আর এক পাও এগুচ্ছে না। একহাত সামনের দিকে এগুচ্ছে তো দশহাত পেছুনের দিকে হটে যাচ্ছে। ঝড়ের বেগ না কম্‌লে বজরা কিছুতেই এগুতে পারে না।"

প্রবল বাতাসের তাড়নে জল নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছুটিয়াছে,—এই ঘুর্ণি জলের ভিতর পড়িয়া নির্ম্মল যে চিরদিনের মত অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে,—উপেনের তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। উন্মত্ততা না আসিলে কিছুতেই মানুষ এমন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে না। উপেন পাগা-

ণের মত একেবারে কাট হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা মুখে চোখে পড়ায় তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল,—সে এক-বার আসে পাশে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ঝড়ের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু এখনও বাতাসের জোর কমে নাই। বন্ধুর আকস্মিক বিপদে উপেনের মাথার ঠিক ছিল না সে মাঝির দিকে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া বলিল, "এইবার একবার তোমার বাবুকে খুঁজে দেখলে হয় না?"

মাঝি বলিল, "বজরা সেই দিকেই যাচ্ছে,—তবে কি জানেন হুজুর আমরা সেখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ তফাতে এসে পড়েছি।"

উপেন আর কোন কথা কহিল না,—বৃষ্টির হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বজরার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল।

* * * * * *

নির্ম্মল নদীতে ঝাপাইয়া পড়িবামাত্র ডুবিয়া গিয়াছিল,—সে যখন ভাসিয়া উঠিল, তখন ঝড়ের বেগ,—তুফানের নৃত্তন উন্মত্ত তাহাকে একেবারে দিশেহারা করিয়া দিতে লাগিল। সে এক মুহূর্ত্তও এক স্থানে স্থির হইতে পারিতেছিল না,—ঘূর্ণি জলের

প্রবল তুফান কেবলই তাহাকে নিচের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সে প্রায় পনর মিনিট কাল তুফানের সহিত জুঝিয়া কোন ক্রমে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কিন্তু আশে পাশে দূরে কিছুই দেখিতে পাইল না। সমস্ত জগৎ কালো আবরণে একেবারে মুখ ঢাকিয়াছে। সে যে স্রোতের তোড়ে পড়িয়া তাহাদের বজরা হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে,—তাহা আর বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। তাহার দৃষ্টি যতদূর চলে সে একবার বালিকাকে দেখিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু কোথায়ও বালিকার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। এই ঝড়-তুফানের মাঝে পড়িয়া বালিকা যে সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। রাক্ষসী নদী যে বালিকাকে চিরদিনের মত গ্রাস করিয়াছে তাহাতে আর কোনই ভুল নাই। নির্ম্মল সন্তরণে বিশেষ পটু ছিল, সে যখন এ তুফানে নিজেকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না প্রতি মুহূর্ত্তে জলের নীচে যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে,—তখন ক্ষুদ্র বালিকার সাধ্য কি এই রাক্ষসী নদীর সহিত জুঝিতে পারে! আজ দুই বৎসর যে প্রতীমাখানিকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া সে কত আশাই করিয়াছিল আজ এক নিমিষে উন্মাদিনী নদী সমস্তই একেবারে ধুইয়া পুছিয়া একেবারে

সাপ্ করিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল একটা বুক্‌ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তীরের দিকে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছিল ঠিক্ সেই সময় সে দেখিল তাহারই অতি নিকটে বালিকার কেশের শেষ গুচ্ছ একবার ঢেউয়ের ভিতর ভাসিতেছে,—আবার সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে। নির্ম্মলের চক্ষের সম্মুখে জগতের সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। তাহার অলস বাহুদ্বয়ে আবার যেন একটা নূতন বল দেখা দিল,—সে দ্রুত যাইয়া বালিকার সেই কেশগুচ্ছ সবলে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর সে সেই কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া লইয়া বালিকাকে তীরে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্ম্মল প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেই উন্মাদিনী নদীর সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া বালিকাকে লইয়া যখন তীরে তুলিল তখন ঝড়ের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, কেবল বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা প্রবলভাবে পড়িতেছে। নির্ম্মল পাঁজাকোলা করিয়া বালিকার এই অচৈতন্য দেহ তীরের উপর তুলিয়া বালু শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। এত পরিশ্রমে নির্ম্মল একটুও কাতর হইয়া পড়ে নাই,—সে যে তাহার জীবন প্রতীমাকে জল হইতে স্থলে তুলিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দই তাহার সমস্ত হৃদয় কাঁনায় কানায় ভরিয়া

উঠিয়াছিল। বালিকা জীবিত কি মৃত সেইটুকু ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে এতক্ষণে একবার বালিকার মুখের দিকে চাহিল। একি এতো সে বালিকা নয়? ইহাকেতো নির্ম্মল জীবনে কোন দিন দেখে নাই। তাহার এত আনন্দ এত উৎসাহ এক নিমিষে যেন কর্পূরের মত একেবারে উবিয়া গেল। তাহার শিথিল দেহ শিথিল হইয়া একেবারে বালু শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বরদাবাবু গুড়গুড়ির নলটায় মুহুর্মূহু টান দিয়া রাশি রাশি ধূম মুখ হইতে ক্রমাগত ছাড়িতেছিলেন। তাঁহার মুখের উপর বেশ একটা চিন্তার রেখা কাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একখানা আরাম কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারই সম্মুখে একখানা চেয়ারে নির্ম্মল গালে হাত দিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার উদাস মন যেন জগতের সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিবার জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্ত বিস্তৃত আকাশের গাঢ় সুনীলবর্ণ প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণ-মণ্ডিত হইয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। কাহার মুখে কথা নাই। কেবল একটা স্তব্ধ নীরবতা গুড়গুড়ির শব্দে মাঝে মাঝে যেন একটু প্রাণ পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। গুড়গুড়ির নলে টানের পর টান দিয়া যখন বরদাবাবু একেবারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,—তখন তিনি গুড়গুড়ির নলটা ধীরে ধীরে মুখ হইতে বাহির করিয়া সেটাকে বিরক্ত ভাবে একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিলেন। আরও দশ

মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল। এই বিরাট নীরবতার ভিতর নিজেকে নিঝুম করিয়া বালিকার চিন্তায় নির্ম্মল বেশ একটু আনন্দ পাইতেছিল। সেই সময় বরদাবাবুর গম্ভীর স্বরে সেই নীরবতা সহসা বিচলিত হইয়া পড়িল। তিনি আরাম কেদারাখানার উপর হটাৎ উঠিয়া বসিয়া নির্ম্মলের দিকে বার দুই চাহিয়া বলিলেন, "তারপর,—তুমি যখন অনুপমার চুলগুলি ভেসে যাচ্ছে দেখ্‌তে পেলে তখনও কি ঝড় খুব বেশী রকম হচ্ছিলো।"

নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, ধীরে ধীরে বরদাবাবুর দিকে মাথাটা ফিরাইলেন ;—বলিলেন, "তখনও ঝড়ের বেগ সমানই ছিল,—তখনও নদীর ঢেউ তিন হাত চারহাত উচু হয়ে তুলোর মত যেন পরস্পর পিজে যাচ্ছিলো। আমি যত সত্বর সাঁত্‌রে গিয়ে আপনার মেয়ের চুলগুলো ধরে ফেল্‌লুম। তারপর তাকে তীরের দিকে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লুম। বড় কষ্টে শেষ তাকে তীরে তুলতে পেরেছিলুম। যদিও তখনও নদীতে খুবই তুফান ছিল তবুও ভগবানের অনুগ্রহে আপনার মেয়ের প্রাণরক্ষা কর্‌তে পেরেছি এতেই আমি ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিই। তবে আমার বিশ্বাস আপনাব মেয়ে খুব ভাল সাঁতার দিতে পারে কারণ আমি যখন তার চুল ধরি তখনও সে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয়ে পড়েনি।

তুফানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সে তখন সবে মাত্র ডুবতে আরম্ভ করেছিল।”

বরদাবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, “হু’, তোমার ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়, আমার মেয়ে খুব ভাল না হক্ একটু একটু সাঁতার দিতে জানে। সে যাক্ তারপর কি করে তুমি জান্‌তে পারলে যে মেয়েটি আমার?”

নির্ম্মল উত্তর দিল, “আমি যখন আপনাব মেয়েকে চড়ায় নিয়ে গিয়ে তুল্‌লুম তখনও আপনার মেয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হ’য়ে পড়ে নি,—তবে বিশেষ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বটে। তীরের উপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাক্‌বার পরেই ধীরে ধীরে তার দেহ ক্রমেই অনেকটা সুস্থ হয়ে আসতে লাগলো। তারপর সে চোখ মেলে চেয়ে আমাকে সম্মুখে বসে থাক্‌তে দেখে কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়ে পড়্‌লো। আমি তাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে একে একে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে সব কথা জেনে নিলুম। তারপর সেই তীরের উপর বহুক্ষণ আমরা আমাদের বজরার জন্যে অপেক্ষা করলুম। কিন্তু বজরার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। শেষ আমি বহুকষ্টে একখানা জেলে ডিঙ্গি জোগাড় করে, আপনার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছুতে পেরেছি।

বজরা ডুবলো কি রইলো তার কোন সন্ধানই পায়নি। আমার বিশ্বাস ঝড়ে দু'খানা বজরাই ডুবে গেছে। নইলে একখানা না একখানা আমাদের অনুসন্ধানে নিশ্চয়ই আসতো।"

বরদাবাবু চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস এক কল্কে তামাক দিয়ে যা!"

নির্ম্মল বলিতে লাগিল, "বজরায় আমার একটী বন্ধু আছে, তার জন্যেই আমার মনটা সব চেয়ে বেশী অস্থির হয়েছে। সে সবে মাত্র কাল আমাব এখানে এসেছে। সে কিছুতেই আমাব সঙ্গে আসতে চায়নি,—আমিই তাকে জোর করে নিয়ে এসেছিলুম, তার যদি ভালো মন্দ কিছু হয়ে থাকে তাহ'লে আমার তার চেয়ে বেশী আক্ষেপেব বিষয় আর কিছুই থাকবে না!"

ভৃত্য আসিয়া দগ্ধ কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গেল। বরদাবাবু আবার গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে গোটা দুই টান দিলেন। কিন্তু ধূম মোটেই বাহির হইল না,—তাম্রকূট তখনও ধরিয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এমন বেশী ঝড় হয়নি যাতে দু' দু' খানা বজরাই ডুবে যেতে পারে। আমার বিশ্বাস বজরা একখানা'ও ডোবেনি। তারা তোমাদের খোঁজে খুব সম্ভব

উল্টো দিকে ভুলক্রমে গেছে। তারপর তোমাদের কোন সন্ধান না পেয়ে এখন পর্যান্ত তোমাদের নদীতে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।”

নির্ম্মল বরদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বলিল, “তাই যদি হয় তাহ'লেও তো তারা অন্ততঃ আপনাকে একটা সংবাদ দিয়ে পাঠাবে যে এই ব্যাপার হয়েছে। তাহ'লেতো আপনি বহু পূর্ব্বেই সংবাদ পেতেন।”

বরদাবাবু তখন গুড়গুড়ির নলটায় টানেরপর টান দিয়া তাম্রকূট ধরাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি একটা বড় রকম টান দিয়া কিছু ধোঁয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, “যদি বজরা দু'খানা ডুবতো তাহ'লে নিশ্চয়ই সংবাদ পেতেম, কিন্তু ডোবেনি বলেই এখন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সদরের এত কাছে যদি দু'দু'খানা বজরা নদীতে ডুবতো তাহ'লে কি তার সংবাদ সদরে আসতে এখন বাকি থাকে।”

নির্ম্মল আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে বরদাবাবুর কন্যাকে আসিতে দেখিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। অনুপমা একখানি ট্রের উপর করিয়া কেটলি পেয়ালা প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জমগুলি লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বরদাবাবু

কন্যাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা আজ তোমার জীবন-রক্ষা-কর্ত্তা তোমারই বাড়ীতে অতিথি। যে তার নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়েছিল,—তার সেবা যত্ন কতদূর করা উচিত তা বোধ হয় মা তোমাকে আব শিখিয়ে দিতে হবে না। তার কাছে তুমি চিরদিনের জন্য ঋণি রইলে একথা যেন মা একদিনের জন্যেও ভুল না। নির্ম্মল আমার বন্ধুর ছেলে,—তোমাব জীবন রক্ষা-কর্ত্তা সে যে আমাদের কত আপন তাতো মা মুখে বলে জানান যায় না।

অনুপমা পিতার কথায় কোন উত্তর দিল না। সে অবনত মস্তকে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাগুলি একে একে সাজাইয়া কেটলি হইতে তাহাতে চা ঢালিয়া, একটী পেয়ালা নির্ম্মলের দিকে সরাইয়া দিল। নির্ম্মল পেয়ালাটা ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া সেই উষ্ণ চায়ের পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়া পেয়ালাটাকে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতে রাখিতে বরদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একবার তাদের একটু অনুসন্ধান করবার বন্দোবস্ত করলে হয় না?"

বরদাবাবুও একটী পেয়ালা টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনিও এক চুমুক চা পান কবিয়া বলিলেন, "প্রত্যূষে উঠেই আমি সে বন্দোবস্ত

করেছি। দুইজন লোককে নদীর তীরে তীরে অনুসন্ধান করে হেঁটে বাসন্তীপুর পর্য্যন্ত যেতে বলে দিয়ে পাঠিয়েছি। যা'হ'ক একটা সংবাদ যে আমরা অতি শীঘ্রই পাবো তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

অনুপমা টেবিলের সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল,—সে তাহার চখের কালো কালো তারা দুইটি নির্ম্মলের দিকে তুলিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জন্যে কি কিছু খাবার নিয়ে আসবো ?"

নির্ম্মল বালিকার দিকে চাহিল, সরলা বালিকার সরল মধুর কণ্ঠস্বর তাহার বড়ই মধুর ঠেকিল, সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "না, —সকালবেলা আমি শুধু এক পেয়ালা চাই খেয়ে থাকি, অন্য বিশেষ কিছু আর খাইনি,—সকালবেলা চায়ের সঙ্গে একটু কিছু খাবার খেলেই আমার ক্ষিধে মরে যায়।"

বরদাবাবু আরাম কেদারাখানায় চীৎ হইয়া পড়িয়া গুড়্‌গুড়ির নল টানিতেছিলেন; নির্ম্মল নীরব হইবা মাত্র বলিলেন, "তাহ'লে থাক খাবার খেয়ে কাজ নেই। আর এদেশের বাজারের খাবার যত না খাওয়া যায় ভাল।"

একখানা গাড়ী আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাড়াইল। বরদাবাবু

কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, তিনি মহা উদ্‌গ্রীবভাবে গাড়ীর দিকে চাহিলেন। গাড়ী ফটকেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র এক ব্যক্তি গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী কি উকিল, বরদাচরণ মিত্রের ?"

নির্ম্মলও গাড়ীর দিকে চাহিয়াছিল, আরোহী গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিবা মাত্র সে একেবাবে চেয়াব ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। এ যে উপেন! বন্ধুর জন্য নির্ম্মলের প্রাণটা একেবারে অস্থিব হইয়া উঠিয়াছিল। গাড়ীতে তাহাকে দেখিয়া আনন্দে সমস্ত প্রাণটা নির্ম্মলের একেবারে ভরিয়া গেল। সে ববদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিল, "এই আমার বন্ধু উপেন।"

এই বাড়ীই উকিল বরদাচরণ মিত্রের এই সংবাদটুকু বেহারার মুখে পাইবামাত্র উপেন গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মল তাড়াতাড়ি যাইয়া বন্ধুকে আগাইয়া লইয়া আসিল। নির্ম্মল বন্ধুকে একখানা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "তারপর ব্যাপার কি আমরাতো তোমাদের জন্যে ভেবেই অস্থির হচ্ছিলুম। আমারতো দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বজরা ডবে গেছে। তোমরা এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?"

উপেন বন্ধুর দিকে বেশ একটু অবাক ভাবে চাহিয়াছিল,—ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আমরা কোথায় ছিলুম না তোমরা কোথায় ছিলে? তোমায় যে আবার আমি এমন সুস্থ সবল অবস্থায় দেখ্‌বো তার আমি একটুও আশা করিনি। কাল রাত্তির যে আমার কি ভাবে কেটেছে তা কেবল ভগবানই জানেন। সারারাত নদীর তীরে তীরে তোমার খোঁজ করে বেড়িয়েছি। শেষ তুমি যে আর বেঁচে নেই সে বিষয়ে একেবারে স্থির নিশ্চিত হয়ে ছিলুম। ভগবান যে তোমায় রক্ষা করেছেন এই তোমার বহু পুণ্য। যাক সে মেয়েটির কোন সন্ধান পেলে?"

নির্ম্মল অনুপমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই যে তোমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি। ভগবান বিশেষ সদয় ছিলেন বলেই এই মেয়েটিকে আমি রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি।"

বন্ধুর কথায় উপেনের দৃষ্টি অনুপমার উপর পতিত হইল,—নির্ম্মলের কথায় অনুপমাও উপেনের দিকে চাহিয়াছিল, কাজেই চারিচক্ষু মিলন হইল। অনুপমা লজ্জায় ঘাড়টি নত করিল। বালিকার দিকে চাহিবা মাত্র উপেনের প্রাণে যেন একটা নূতন লহর খেলিয়া গেল। বালিকার চক্ষের কালো তারা দুইটির ভিতর সে যেন এক স্বপ্নরাজ্যের ছবি দেখিতে পাইল।

বালিকার দিকে চাহিয়া থাকিতে তাহারও কেমন বেশ একটু লজ্জা বোধ হইতে লাগিল সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। বরদাবাবু বেশ একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আর একখানা বজরার সংবাদ কি,—বজরাখানার আপনি কোন খবব জানেন ?"

বরদাবাবুর কথায় উপেন বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ,—সে বজরাও তো আমাদের সঙ্গেই সমস্তরাত ছিল,—এই একটু আগে থেকে সে বজরাখানা বাসন্তীপুবে ফিবে গেছে। যাবার সময় সেই বজরায় যে মেয়েটি ছিল সে এই পত্রখানা আপনাকে দিতে বলেছে।"

উপেন পত্রখানা বরদাবাবুর হস্তে দিল,—বরদাবাবু পত্রখানা হস্তে লইয়া অনুপমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও তো মা অনু আমার চশমাখানা নিয়ে এসতো !"

পিতার আদেশে অনুপমা চশমা আনিতে চলিয়া গেল,—উপেনের যেন মনে হইল,—বালিকার সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত আলো অনুসরণ করিল। ফুলদেবতা এক লহমায় তাহার সমস্ত জীবনের যাত্রার পথটা একেবারে যেন ওলোট পালোট করিয়া দিল। সে একবাব ঈষৎ মাথাটা তুলিয়া বন্ধুর দিকে চাহিল। বরদাবাবু

নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নির্ম্মল তোমার বন্ধুটির তো আমার সঙ্গে কোন পরিচয় করিয়ে দিলে না।"

নির্ম্মল একটু অন্যমস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, বরদাবাবুর কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে আমার বন্ধু উপেনের মত ছেলে প্রায় দেখা যায় না। সম্প্রতি বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে এম, এ, পাস করেছে। এইবার ল পড়বে। ওদের বাড়ী শান্তিপুরে। উপেনের বাবা ৺বামাপদ সরকার শান্তিপুরের মধ্যে একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ওদের বিষয় সম্পত্তিও শান্তিপুরে যথেষ্ট।"

বরদাবাবুর আইন প্রপীড়িত মস্তিস্কে সহসা কি ভাবের উদয় হইল ভগবান তাহা বলিতে পারেন! নিম্মল নীরব হইবা মাত্র তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বন্ধুটির বিয়ে থা হয়েছে?"

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে না,—এতদিন পড়ার ক্ষতি হবে বলে বিয়ে থা করেনি, এইবার বোধ হয় বিয়ে থা করবে!"

বরদাবাবু আর কোন কথা কহিলেন না গুড়গুড়ির নলটায় গোটা দুই টান দিলেন। অনুপমা তাহার চশমা লইয়া উপস্থিত

হইল। তিনি কন্যার হস্ত হইতে চশমাখানা লইয়া ধীরে ধীরে তাহা নাসিকার উপর স্থাপন করিয়া উপেনের প্রদত্ত পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন,—পত্রে সামান্যই লেখা ছিল, তাহার মর্ম্ম এই। "কাকাবাবু,—দৈব দুর্ঘটনার সমস্ত সংবাদই এই ভদ্রলোকটির নিকট শুনিতে পাইবেন। সই আর নাই এইটুকু লিখিতেই আমার বুক ফাটিয়া যাইবাব মত হইতেছে। এ অবস্থায় আমি আর কোন মুখে আপনার নিকট উপস্থিত হইব। কাজেই আমি বাসন্তিপুরে ফিরিয়া চলিলাম। যদি সই জীবিত আছে কোন দিন এ সংবাদ পাই তবেই আবার আপনার নিকট উপস্থিত হইব। আমার বিবাহ ভগবানের অভিপ্রেত নয় নতুবা এমন দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন? আপনি আব আমার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিবেন না। আপাতত আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না।

বরদাবাবু পত্রখানা পাঠ করা শেষ করিয়া একবার নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর পত্রখানা কন্যার হস্তে দিয়া বলিলেন, "পড় তোমাব সই কি লিখেছে দেখ?"

অনুপমা পিতার হস্ত হইতে পত্রখানা গ্রহণ করিয়া দুই তিন বাব পত্রখানা পাঠ করিয়া ধীরে ধীবে বলিল, "বাবা, আপনি

সইয়ের ওসব কথা শুন্‌বেন না,—বিয়ে করবো না, বিয়ে করবো না সইয়ের ওই এক বাই হয়েছে।”

বরদাবাবু মাথাটা নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “তোমার সই লিখেছে এরূপ দুর্ঘটনার পর আপনি আর আমার বিয়ের চেষ্টা করবেন না তা যখন ভগবানেব ইচ্ছায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তখন যেমন কথাবাত্র্া আছে সেই মতই কার্য্য হবে। কাল সকালেই আমি নির্ম্মলকে নিয়ে বাসন্তীপুরে রওনা হব। চল মা তুমি আমাদের সঙ্গে যাইয়া তোমার সইকে বেশ একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌বে স্ত্রীলোকের বিবাহ ভিন্ন ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না।”

বরদাবাবুর কথাগুলি নির্ম্মলেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। বালিকা বিবাহ করিতে চায় না কেন? তবে কি বালিকা আমারই ন্যায় হৃদয়াসনে কাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবাহে অসম্মত হই-তেছে। সহসা একটা কথা হৃদয়ে ঘা দেওয়ায় নির্ম্মলের সমস্ত প্রাণটা একেবারে দর-দর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে চাহিল। বরদাবাবু বলিলেন, “নির্ম্মল তাহ'লে কালই আমাদের পাত্রী দেখ্‌তে যাওয়া স্থির হ'লো। কাল সন্ধ্যার পর আমরা বাসন্তীপুরে রওনা হবো?”

ববদাবাবুব কথায় নির্ম্মল আবাব ববদাবাবুর মুখের দিকে

চাহিয়াছিল,—ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "পাত্রী যখন বিবাহ কর্ত্তে চায় না,—তখন সেখানে না যাওয়াই—

বরদাবাবু নির্ম্মলকে আর কথাটা শেষ করিতে দিলেন না তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সে জন্যে তোমার চিন্তা নেই। এই দুর্ঘটনার জন্যই সে এ কথা লিখেছে। যখন শুনবে তার সইএর কোন বিপদ হয়নি ভগবানের অনুগ্রহে তার জীবন রক্ষা হয়েছে আর তার আপত্তি করবার কিছুই থাকবে না।"

নির্ম্মল কোন কথা কহিল না। কেবল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড়টা অবনত করিল। অনুপমা তাহার পিতার কথার উত্তরে বলিল, "না বাবা, আমি বললে সই আর কোন মতে অমত কর্ত্তে পারবে না। সই আমাকে বড় ভালবাসে সেতো কখন আমার কথা ঠেলে না। আমি যেমন করে পারি এ বিয়েতে সইকে রাজি করবোই।"

বরদাবাবু ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "তা আমি জানি,—তনিমা তো তেমন মেয়ে নয় সে যখন আমায় বলেছে,—তখন আর সে কথার অন্যথা করবে না। সে যে আমায় তার আপনার কাকার চেয়েও অধিক ভক্তি করে।"

আবার তনিমা! এই তনিমা কি সেই তনিমা। এই কথাই

বারবার নির্ম্মলের মনের ভিতর আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি সেই সব। অথচ সে ভিখারিনী এ রাজরাণী। কেমন করিয়া সে তনিমা এই তনিমা হইবে! নির্ম্মল কিছুই ঠিক করিতে পারিল না,—যত চিন্তা আসিয়া তাহার সমস্তই যেন গোলমাল করিয়া দিতে লাগিল। আর বিশেষ কেহই কোন কথা কহিল না। পরদিন সন্ধ্যার পরই যে তাহারা সকলে বাসন্তীপুরে রওনা হইবেন সেইটাই কেবল পাকা হইয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিচিত্র বর্ণের শত শত পাখীর সহস্র কলকণ্ঠে উষার আহ্বান সঙ্গীতে সমস্ত জগৎ মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। শান্তিরূপিনী শান্তিদায়িনী পল্লীজননীর নির্ম্মল বক্ষে প্রভাতের আলো শিশুর কমনীয় হাসির মত ফুটিয়া উঠিতেছিল। ফুলের গন্ধ লুটিয়া লইয়া স্নিগ্ধ সমিরণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া যাইতেছিল। অতি প্রত্যুষেই তনিমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। সে শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ছাদের উপর উঠিয়াছিল। শত চিন্তায় আজ তাহার প্রাণ পরিপূর্ণ। সমস্ত প্রাণটা তাহার যেন একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীতে আসিয়া কেবলমাত্র তিনটি লোকের সে যত্ন আদর পাইয়াছে আজ সেই তিনটি লোকই আর নাই। এ কথা ভাবিতেও তনিমার সমস্ত প্রাণটা ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হইতেছিল। যে জননী তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, তিনি রোগ শয্যায় অনাহারে, চিকিৎসা বিহনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার পর সে সই পাইয়া

ছিল,—সে তাহাকে বড় ভাল বাসিত, সেও দৈবদুর্ঘটনায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণ দিল,—আর একজন সেতো কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া, কাল আসিব বলিয়া আর আসে নাই। তাহার পর দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে সে যে আর আসিবে সে সম্ভাবনাও নাই। তবে আর তাহার এ পৃথিবীতে জীবনধারণ করিয়া লাভ কি? এই সকল চিন্তায়ই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণ একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তনিমা ছাদের এক কোনে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া এই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিল, আর তাহার দুই নয়ন বহিয়া ঝর ঝর করিয়া কেবলই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।
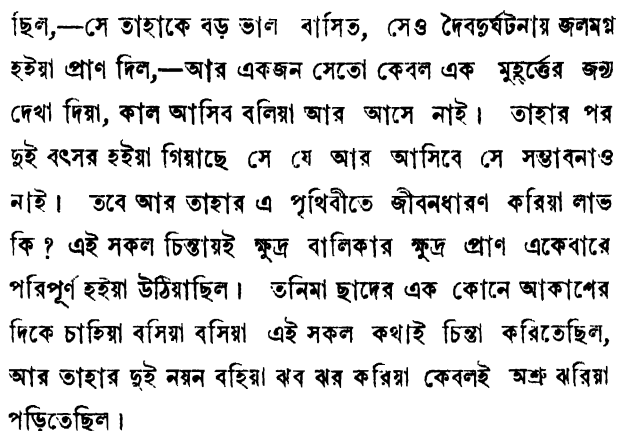
শত চিন্তায় তনিমার বাহ্যজ্ঞান একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সহসা দাসীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সে চমকিত হইয়া সম্মুখে চাহিল। তনিমাকে সম্মুখে চাহিতে দেখিয়া দাসী একগাল হাসিয়া বলিল, "দিদিমনি, তুমি এখানে বসে আছ, আমরা এদিকে তোমাকে খুঁজে সারা হচ্ছি। সই-দিদিমনি যে এসেছেন, তার বাপ এসেছেন আর কত কে সব এসেছেন?"

সই দিদিমনি এসেছেন। তনিমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে যেন বিস্ময়ে দুলিয়া উঠিল। সে অবাক ভাবে দাসীর মুখের দিকে

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "সই দিদিমনি এসেছেন সে কি ! সে কেমন করে আসবে ?"

দাসী তনিমাকে বাধা দিয়া বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় বলিল, "সে কি,—কিগো দিদিমনি ? যথার্থই সই দিদিমনি এসেছেন। কেমন করে আসবেন না আসবেন তা জানিনি দিদিমনি, তবে তিনি এসেছেন। আমার কথা হয় কি নয় নীচে গেলেই বুঝতে পারবে ?"

তনিমা আর কোন কথা কহিল না হৃদয়ে একটা আকুল বিস্ময় লইয়া নীচে কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য উঠিতে যাইতেছিল,—সেই সময় অনুপমা হাসিতে হাসিতে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "সই,—"সই,—দেখবি চল কেমন তোর বর নিয়ে এসেছি। যেমন দেখতে তেমনি বিদ্বান।"

অনুপমা যে বাঁচিয়া আছে তনিমার সে বিশ্বাস আর মোটেই ছিল না। সে তাহার সইকে সম্মুখে দেখিয়া বিহ্বল ভাবে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। অনুপমা আবার মৃদু হাসিয়া বলিল, "সই আমার কথা বুঝি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি ভাই তোর বর নিয়ে এসেছি। সত্যি কি না দেখবি ?" আমি এসেছি,—বাবা এসেছেন,—তোর বর এসেছে,—আর তোর বরের এক বন্ধু এসেছে। চ' নীচে বাবা তোকে ডাক্‌ছেন !"

তনিমার এতক্ষণে বিস্ময়ের ধমকটা অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছিল,—সে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া অবাক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ সই তুই এখন বেঁচে আছিস্?"

সইএর কথায় অনুপমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল;—হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "মরণ আর কি ঢং দেখে আর বাঁচিনি। ওর সামনে আমি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রইছি, আর ওনি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কিনা, হাঁ সই তুই এখন বেঁচে আছিস্? বলি বরের নাম শুনেই যে সই তোর মাথা একেবারে গুলিয়ে গেল"

অনুপমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তনিমা কেবল মাত্র মৃদু হাসিল। সে আবার তাহার সইএর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ সই তুই জল থেকে উঠ্‌লি কি করে।?"

অনুপমা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "সে ভাই অনেক কথা,— তবে এইটুকু শুনে রাখ যে, তোর হবু বর আমায় জল থেকে তুলেছে। সেই যে আমাদের সম্মুখে একখানা বজরা আসছিল, তাতেই তোর বর মশাই বাবার কাছে যাচ্ছিলেন। আমাকে নদীর জলে পড়তে দেখে,—আমাকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। নে এখন ওঠ,—চ' বাবার সঙ্গে দেখা করবি চ'! "দেখ্‌ছিস্ তোর বর এসেছে তোকে দেখ্‌তে,—এখন কি আর

অমন বসে থাক্‌লে চলে। সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে চ' ; সেজেগুজে না গেলে শেষ বর অপছন্দ করবে।"

তনিমা তথাপি উঠিল না, সে তাহাব সইয়ের মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিল। অনুপমার মুখে বর আসিয়াছে শুনিয়া একজনেব কথা আজ তাহার প্রাণের ভিতব বড় ব্যথা দিয়া জাগিয়া উঠিল। আজ দুই বৎসর সে যে তাহাকেই হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তাহার স্মৃতিটুকুরই পূজা করিয়া আসিতেছে। বড় ব্যথায় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়ন কোনে উচ্ছলিয়া উঠিয়া টস্ টস্ করিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সহসা সইয়ের নয়নে অশ্রু দেখিয়া অনুপমা বড় বিচলিত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি সইএর সম্মুখে বসিয়া তাহাব হাত দুইটি ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সই কি হয়েছে তোর, ওমন করে কাঁদছিস্ কেন ? ছি ওমন করে শুধু শুধু কি কাদতে আছে।"

তনিমা কোন উত্তব দিল না,—অনুপমার কথায় তাহার নয়নের অশ্রু আরও প্রবল হইয়া উঠিল। সে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিল। অনুপমা সত্যই তনিমাকে বড় ভালবাসিত ; সে সইকে কাঁদিতে দেখিয়া মহা কাতরভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সই, কাঁদছিস্ কেন ! কি হয়েছে তোব,—আমাকে বলবিনি ?"

এইবার তনিমা কথা কহিল, সে অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বলিল, "সই আমি বিয়ে করবো না!"

তনিমার কথায় অনুপমা বেশ একটু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। গম্ভীর ভাবে সইয়ের কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "ছি সই বিয়ে করবো না এ কথা কি তোর এখন বলা ভালো। বাবা শুন্‌লে কি বল্‌বেন, তা'ছাড়া আমার প্রাণদাতার হস্তে আমার সইয়ের মত রত্ন দান করে আমি যে ঋণ মুক্ত হব ভেবেছি। ছি সই বিয়ে করবো না এ কথা আর মুখে আনিস্‌নি! বাবা সে দিন কি বল্‌লেন শুনেছিস্ তো,—মেয়ে মানুষের বিয়ে না হ'লে তার জীবনই সার্থক হয় না।"

তনিমা নীরব, সে অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিতে লাগিল। অনুপমা একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "নে ওঠ, চোখ মোছ। ভগবান যা করেন, জানিস্ মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন।"

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন,—দেবতার বাণীর মত এই কয়টি কথা তনিমার প্রাণের ভিতর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে নিজেকে প্রাণপণ শক্তিতে দৃঢ় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনুপমাও আর কোন কথা না বলিয়া, সইয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে নিয়ে তাহার পিতার নিকট লইয়া গেল।

নির্ম্মল ও উপেনকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া তনিমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বরদাবাবু অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতলের একটী সজ্জিত কক্ষের ভিতর একখানি সোফার উপর উপবিষ্ট হইয়া তনিমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনুপমার সহিত তনিমা আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। কন্যাও কন্যার সইকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বরদাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এস মা এস। আমি তোমার পত্র পেয়েছিলুম,—কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় অনুপমা রক্ষা পাওয়ায় আমি আমার কথা মত যে পাত্রটির সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির করেছিলুম তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আমি যতদূর জানি পাত্র খুবই ভালো। আজ দেখা শুনো শেষ হ'লে যত শীঘ্র সম্ভব একটা ভালো দিন দেখে আমি তোমায় তোমার স্বামীর হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হব। মা তোমার বাবার কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণি। অনেক কষ্টে তোমার পিতার বিষয় তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি,—এই বার একটী সুপাত্রের হস্তে তোমাকে অর্পণ কর্ত্তে পারলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়।"

তনিমা কোন কথা কহিল না, অবনত মস্তকে বরদাবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আজ তাহার প্রাণের কোথায়ও একটু

সুখ কিংবা একটু শান্তি ছিল না। সমস্ত শান্তি যেন একখানা কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বরদাবাবু নীরব হইবা মাত্র অনুপমা বলিল, "বাবা সই কাঁদছিল,—সে বিয়ে কর্ত্তে চায় না।"

কন্যার কথায় বরদাবাবুর মুখখানা বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল। তিনি কন্যার কথায় বাধা দিয়া তনিমার মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা,—বিয়ে তোমার না করবারতো আর কোন কারণ নেই। মেয়েমানুষের যে বয়সে বিয়ে হওয়া উচিত এক্ষণে তুমি মা সেই বয়সে পদার্পণ করেছ,—বিয়ে কি,—বিয়ের গুরুত্ব কত বড় তাহা অন্ততঃ বোঝবারও তোমার এখন ক্ষমতা হয়েছে। এখন কি আর মা তোমার বিয়ে করবো না বলা সাজে! বলেছিতো মা তোমায়,—নারী জীবন স্বামী পদে নির্ম্মাল্য না হ'লে সে জীবনের কোন মূল্য থাকে না;—সমাজ কুকথা কয়।"

কেহই কোন উত্তর দিল না বরদাবাবু একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি ভাবছি মা অনুর বিয়েও ওই এক দিনেই দেব। তোমাকে যিনি দেখতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুও এসেছে। পরিচয় নিয়ে জানলুম তারা আমাদের পালটা ঘর। ছেলেটি ভালো, ভগবানের মনে কি আছে জানিনি,—যদি সম্ভব হয় সেই ছেলেটির সঙ্গেই আমি অনুর বিয়ে দেব।"

অনুপমা পিতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, পিতার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার মুখখানি একেবারে কাল হইয়া উঠিল, সহসা যেন লজ্জারাণী রাজ্যের লজ্জা সঙ্গে আসিয়া তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখখানি মাটীর দিকে নত হইয়া পড়িল। বরদাবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও মা অনু তোমার সইকে নিয়ে যাও। আমাদের চিরদিনের প্রথা—কন্যা দেখাবার সময় কন্যাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দেখাতে হয়। তুমি তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দাওগে যাও। ততক্ষণ আমি যারা এসেছেন তাদের যত্ন খাতির করিগে।"

অনুপমা কিংবা তনিমা কেহই কথা কহিল না। বরদাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, দরজার নিকট যাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাও মা আর দেরী করো না, শুভ-কাজ যত শিগ্‌গির শেষ হয় ততই মঙ্গল।"

বরদাবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দুই সই কাহার মুখে কথা নাই। পরস্পরে মুখোমুখী করিয়া নীরবে দণ্ডায়মানা। দুই জনেরই প্রাণের ভিতর চিন্তার স্রোত বহিতেছিল,—কিন্তু গতি ভিন্ন। একজনের সোনার আলো জ্বালিয়া তাহাতে সোনার

দেশের আভাস দিতেছিল। অপরের কেবলই অন্ধকার তাহার ভিতর আলো প্রবেশের একটুও ফাঁক ছিল না। ঘরের ভিতর গমগমে নীরবতা বিচলিত করিয়া সর্ব্ব প্রথম অনুপমা কথা কহিল; সে তাহার সইএর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চ,' সই আর দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নি। 'চ' তোকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে যাই। বাবা হয়তো এখনি আবার ডেকে পাঠাবেন।"

তনিমা কোন কথা কহিল না, তাহার পদ-নিম্নে মেদিনী দুলিতে ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের বিবাহ না করিলে চলে না,—সমাজে কু কথা কহে। সে সমাজের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল; নীরবে তাহার সইয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অনুপমা তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব তাহার সইকে মাজিয়া ঘসিয়া সাজাইয়া গুজাইয়া দিল। তনিমা তাহার কোন কিছুতেই আপত্তি করিল না। তাহার সই তাহাকে যেমন ভাবে সাজাইয়া দিল,—সে বিনা আপত্তিতে তেমনি ভাবে সাজিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বরদাবাবু তনিমাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য আবার অন্তঃপুরে 'প্রবেশ করিলেন। বরদাবাবু যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তনিমা অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হইয়াছে। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে

সজ্জিত হইয়া তাহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিখানি আজ যেন দেববালাব মত শত শোভায় বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ম্লান গম্ভীর মুখখানি হইতে আজ এক স্বর্গের জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। বরদাবাবু কিছুক্ষণ মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "চল মা এইবার দেখা শোনাটা শেষ হয়ে যাক্। বাড়ীতে অতিথি এসেছে তাদেব আবার সকাল সকাল আহারের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।"

তনিমা কোন উত্তর দিল না;—বরদাবাবু সস্নেহে তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য ফিরিতেছিলেন, সেই সময় সহসা তিনি তনিমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর প্রণাম করে এসেছ মা,—শুভ কাজের পূর্ব্বে দেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাওয়া ভালো। যাও মা ঠাকুর প্রণাম করে এস। আমি ততক্ষণ এইখানে অপেক্ষা করি।"

তনিমা ঠাকুর প্রণাম করিবার জন্য ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের বাটীর পশ্চাতে ঠাকুর বাড়ী। বাটীর বিগ্রহ শ্রীমাধবের মন্দিরের দরজার সম্মুখে আসিয়া সে নতজানু হইয়া বসিয়া করজোড়ে অতি কাতর কণ্ঠে মনে মনে বলিল, "প্রভু! আমাব দেবতাকে তুমি আনিয়া দাও। আমি

যে আজ দুই বৎসর হইল মনে মনে তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি।”

মন্দিরের দেবতা বৃদ্ধ, আজ কত শতাব্দি ধরিয়া তিনি এই মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন তাহার সঠিক খবর কেহই বলিতে পারে না। বালিকার কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না তাহাও বলা কঠিন কারণ বালিকার কথায় পাথরের দেবতার বিশেষ কোনই বৈলক্ষণ ঘটিল না। তিনি যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তনিমা দেবতার আশীর্ব্বাদ পাইল কিনা তাহাও সে বুঝিল না;—সে মন্দিরের দরজার সম্মুখে মাথাটা ভূমিতে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইল। আশীর্ব্বাদ লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটুক আর নাই ঘটুক সে দেবতার চরণে প্রাণের কথা জানাইয়া প্রাণে যেন একটু শান্তি পাইল। সে ঠাকুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরদাবাবু তাহার জন্য যেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তনিমাকে আসিতে দেখিয়া বরদাবাবু বলিলেন, “চল মা আর দাড়িয়ে কাজ নেই। বেলাও ঢের হয়েছে।”

তনিমা কোন কথা কহিল না,—বরদাবাবু অগ্রসর হইলেন,—

তনিমা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাহির বাটীর বৈঠকখানায় দুই বন্ধুতে বসিয়া বরদাবাবুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। বরদাবাবু পাত্রী আনিতে গিয়াছেন,—কাজেই একটা আকুল আগ্রহ সমস্ত ঘরটাব ভিতর ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উপেন তাহার কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য বন্ধুকে নানা প্রশ্ন করিতেছিল,—কিন্তু নির্ম্মল বিশেষ কোন উত্তর দিতেছিল না। সে কেবল হাঁ হুঁ করিয়া বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর সারিয়া লইতেছিল। বন্ধুর কথার উত্তর দিবার তাহার আজ আর শক্তি ছিল না,—কে যেন সমস্ত প্রাণটা চঞ্চল করিয়া কেবলই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "এই তনিমা কি সেই তনিমা।"

বরদাবাবু তনিমাকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তনিমার রূপের প্রভায় সমস্ত গৃহ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তাহার অঙ্গের অলঙ্কারের মধুর নিক্কন নির্ম্মলের কর্ণে প্রবেশ কবিবা মাত্র তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন কেমন একটা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহার যেন কেমন সাহস হইল না,—সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। অলঙ্কারের শব্দে উপেন দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল,—সে তনিমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি,—ম্লান গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া কেমন

যেন একটা ভক্তিতে তাহার সমস্ত প্রাণটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। বরদাবাবু তনিমার হাতখানি ধরিয়া গৃহের মধ্যস্থানে লইয়া আসিয়া বলিলেন, "বোস মা এইখানে।"

তনিমা অতি ধীরে গৃহের মধ্যস্থলে ফরাশের উপর উপবিষ্ট হইল। তাহার চক্ষের সম্মুখে তখন জগতের সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়াছিল। একটা কেবল গাঢ় অন্ধকার চারিপার্শ্ব হইতে আসিয়া তাহাকে যেন একেবারে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। বরদাবাবু নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বাবা নির্ম্মল এইবার একবার এই দিকে ফিরে দেখ। আমার বন্ধুর কন্যা তনিমা সত্যই সুন্দরী,—অপছন্দ করবার মত এর ভিতর কিছুই নেই।"

বরদাবাবুর কথাগুলি যেন একটা ধাক্কা দিয়া নির্ম্মলের সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। সে চমকিত হইয়া ঘাড় তুলিল। তনিমার মুখখানি নত হইয়া একেবারে যেন মাটির সহিত মিশিয়াছিল,—সে তাহার মুখখানি ভালো দেখিতে পাইল,—তথাপি যেন কেমন একটা পুলক স্পন্দন তাহার সর্ব্বাঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠিল। নির্ম্মলকে ঘাড় তুলিতে দেখিয়া বরদাবাবু তনিমার দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ঘাড়টা একটু তোলতো মা?"

তনিমা ধীরে ধীরে ঘাড়টি একটু তুলিল,—নির্ম্মল বিস্মিত ভাবে তনিমার দিকে চাহিয়াছিল। তনিমা ঘাড়টা একটু তুলিবা মাত্র তাহার সমস্ত মুখখানি একেবারে স্পষ্ট তাহার চক্ষের উপরে পতিত হইল। দিনের আলো গবাক্ষের ভিতর দিয়া আসিয়া বালিকার মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সে আলোয় নির্ম্মল বালিকার মুখের প্রতি রেখাটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। আর কি ভুল হইতে পারে! এ মুখ যে সেই মুখ। তাহার চক্ষের পলক স্থির হইয়া গেল,—চক্ষের তারা দুইটা যেন বালিকার মুখখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য একেবারে বাহিরে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরদাবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাবা মেয়েটি তোমার পছন্দ হয়েছে,—আমি বিয়ে এইবার পাকা করে ফেলতে পারি?"

নির্ম্মলের কর্ণে বরদাবাবুর কথাগুলি প্রবেশ করিবামাত্র তাহার ঘাড়টি যেন নত হইয়া পড়িল,—সে বরদাবাবুর কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কণ্ঠ হইতে বাক্য বাহির হইল না। তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বরদাবাবু আবার বেশ একটু উচ্চ পর্দ্দায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা মেয়েটি তোমার পছন্দ তো?"

নির্ম্মলের কণ্ঠ হইতে এবার আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল, "এ মুখ যে আমার চেনা মুখ। এ মুখ কি আমি ভুলতে পারি!"

নিম্মলের কথাগুলি তনিমার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্রই,—তাহার অবাধ্য নয়ন চুরি করিয়া একবার নিম্মলের মুখের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার দেহের সমস্ত কলকব্জা যেন একেবারে এলোমেলো হইয়া গেল। তাহার শিথিল দেহ, শিথিল হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিল, বরদাবাবু তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিলেন;—মহা বিস্মিতভাবে একবার নির্ম্মলের মুখের দিকে একবার তনিমার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি পরস্পর পরিচিত। পূর্ব্বে কি আর তোমাদের কখন দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি?"

এ কথায় নির্ম্মল কি উত্তর দিবে,—এ কথার তো উত্তর নাই। তাহার লজ্জিত দৃষ্টি একবার চকিতের জন্য বরদাবাবু বিস্মিত দৃষ্টির সহিত বিনিময় হইল। সেই দৃষ্টিটুকুর ভিতর বরদাবাবু যেন সব উত্তর টুক্ পাইলেন। তিনি মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখন আমি সব বুঝতে পারছি। তনিমা যে কেন বিয়ে কর্ত্তে

নারাজ ছিল এতক্ষণে তার কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। এতে আমার আনন্দ ভিন্ন দুঃখ করবার কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের পরস্পরে কোথায় দেখা হয়েছিল,—এটুকু বল্‌তে কি তোমার আপত্তি আছে।"

বিস্ময়ের প্রথম ধমকটা এতক্ষণে নির্ম্মলের অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছিল। বরদাবাবুর প্রশ্নে তাহাকে বড় কিন্তু করিয়া ফেলিল,—উত্তরটা কণ্ঠ অবধি আসিয়া যেন আটকাইয়া গেল,—ঠোট দিয়া আর বাহির হইল না। সে অবনত মস্তকে মস্তক চুলকাইতে আরম্ভ করিল। উপেন বেশ একটু অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। এতক্ষণ একটীও কথা কহে নাই,—বরদাবাবু নীরব হইবা মাত্র সে বন্ধুর দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "সেই গত বছরের আগের বছর আমাদের দেশে রাস দেখ্‌তে গিয়া এই মেয়েটির সঙ্গেই বুঝি তোমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তুমিতো বলেছিলে তারা বড় গরীব। অনাহারে চিকিৎসা অভাবে তার মা মরণাপন্ন। কিন্তু ইনি তো—"

বরদাবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "ঠিক হয়েছে,—সেই সময় তনিমাদের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছিল। তনিমার বাপের মৃত্যুর পর এদের জ্ঞাতিরা এদের সম্পত্তি থেকে

বেদখল করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমি তনিমার মাকে আমার বাড়ীতে থাক্‌বার জন্যে অনেক বলেছিলুম,—কিন্তু তিনি আমার বাড়ীতে থাকতে কিছুতেই স্বীকৃত হন না। বাপের বাড়ী গিয়ে থাক্‌বেন বলে আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে শান্তিপুরে একখানি কুটীরে মেয়েটিকে নিয়ে বাস করেন। অনেক কষ্ট পেয়ে শেষ তিনি মারা গেলেন, তবু কোন দিন পরের গলগ্রহ হননি। তাঁকে আমাব বাড়ীতে রাখতে কিছুতেই স্বীকৃত কর্ত্তে না পারায় শেষ তাঁর সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্য আমি চেষ্টা আরম্ভ করি। অনেক মাম্‌লার পর তাঁর বেদখল সম্পত্তি তাঁকে যখন ফেরত দিতে পারলুম তখন তাঁর শেষ সময় উপস্থিত,—বাড়ীতে এনে তখন তাঁর অনেক চিকিৎসা করালুম কিন্তু তবু তাঁকে রক্ষা কর্ত্তে পারলুম না।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল,—আর কোথায়ও একটুও গোলমাল রহিল না। উপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিধির-বিধি কি খণ্ডন হবার যো আছে। এখন আর পছন্দ অপছন্দের কিছু নেই। এইবার ভেন চড়লেই হয়।"

উপেনের কথায় বরদাবাবু মৃদু হাসিলেন,—বলিলেন, "যার

যে ক'নে তা কি আর বদল হবার যো আছে,—ভগবানের এমনি মজা। যাক এত দিনে আমার কর্ত্তব্যের শেষ হ'লো। এ আনন্দের দিনে আমি তোমাদের প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি,—এ মিলনে যেন তোমরা চির সুখী হও।"

বরদাবাবু একটু নীরব থাকিয়া তনিমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও মা বাড়ীর ভেতর,—তুমি যে তোমাব মোনমত স্বামী লাভ করতে পেরেছ এর চেয়ে আর আমার আনন্দের কিছু নেই। এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে শুভ কাজটা যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল।

আজ যেন তনিমা লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতেছিল,—বরদাবাবুর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মহা সঙ্কোচিতভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সেই গমনের ভঙ্গিমাটুকুতেও আজ যেন এক মহানন্দ ঝরিয়া পড়িতেছিল। হর্ষে আনন্দে নির্ম্মল এতক্ষণ একেবারে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল। তনিমা গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র সে বরদাবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ঠিক নয়। আমার বন্ধু কাজেই আমার তার সুখ্যাতি করা উচিত নয়, কিন্তু সত্যিই উপেনের মত ছেলে খুব কমই আছে। আপনি যদি অনুগ্রহ

করে আপনার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন তাহ'লে সত্যি আজ আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।"

নির্ম্মলের কথায় উপেনের সমস্ত মুখখানা লজ্জায় একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল দুই হাত দিয়া নির্ম্মলের মুখখানা চাপিয়া ধরে। কি একটা বলিবার জন্য তাহার ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বরদাবাবু বলিলেন, "তোমার বন্ধু উপেন যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করে তাতে আমার আপত্তি করবার কি আছে বাবা?"

উপেন মহা বিস্মিত ভাবে নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা কি করে হয়?"

নির্ম্মল মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তা ঠিকই হবে। ঝিঝির ঝিঝি তুমি কি করবে বল?"

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলি।

১। পাষাণে প্রাণ ... ... ১৲

২। রঙ্গবারিধি ... ... ১৲

৩। বিয়ের হাসি .. ... ।/০

৪। একে আর ... ... ।৵০

৫। কুলবধূ ... ... ১৲

৬। সতীর স্বর্গ ... ... ১।০

৭। মিলন .. ... ১৲

৮। ঘরের লক্ষ্মী ... ... ১৲

১০। বিয়ের কনে .. ... ১॥০

১১। বঙ্গ-বালা ... ... ১॥০

১২। বিধির বিধি ... ... ১।০

১৩। মানীর মান ... ... ১॥০

১৪। কালের কোলে ... .. ১৲

১৫। গৃহবিচ্ছেদ ... ... ১॥০

১৬। মাতৃহারা ... ... ১৲

১৭। সমাজ বিপ্লব ... ... ॥০